নবারুণ ভট্টাচার্য

# বেবি কে পারিজাত

নবারুণ ভট্টাচার্য

সপ্তর্ষি প্রকাশন

| | |
|---|---|
| প্রথম প্রকাশ | জানুয়ারি ২০১৩ |
| প্রচ্ছদ | হোয়াইট পেপার |
| © | প্রণতি ভট্টাচার্য |
| প্রকাশক | স্বাতী রায়চৌধুরী<br>সপ্তর্ষি প্রকাশন<br>৫১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট<br>কলকাতা ৭০০ ০০৯ |
| মুদ্রক | সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা প্রিন্টিং ওয়ার্কস<br>৬১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট<br>কলকাতা ৭০০ ০০৯ |
| প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র ও যোগাযোগ | ৬৯ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট,<br>কলকাত ৭০০ ০০৯<br>চলভাষ ৯৮৩০৩ ৭১৪৬৭ |
| ই-মেল | saptarshiprakashan@hotmail.com |
| ওয়েবসাইট | www.saptarshipkashan.com |
| সপ্তর্ষি-র বই পাবেন | দে'জ, দে বুক স্টোর,<br>বুকফ্রেন্ড চক্রবর্তী অ্যান্ড চ্যাটার্জি,<br>নবগ্রন্থকুটির, বল্যকা (কলেজ স্ট্রিট),<br>বুকস্ (শিলিগুড়ি), পুস্তকমহল<br>(ভুবনডাঙা, শান্তিনিকেতন)<br>মুক্তধারা (গোলমার্কেট নিউদিল্লি ১) |
| দাম | ১০০ টাকা |

আমার কনিষ্ঠতম হার্টথ্রব
প্লাস স্বাতী
ও সৌরভকে

সদম্ভে

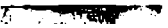

বেবি কে সিরিজের গল্পগুলো মহামহোপাধ্যায় রাজীব চৌধুরির পছন্দানুক্রমে দাঁড়িয়ে আছে বম্বের বারডান্সের নর্তকীদের মতো। অহো! এই দাহ্য ও ভোগের সময়ে, বিকৃতির একজাতীয় অবাধ প্রসারের মধ্যে আমার রাজনৈতিক উপলব্ধির একটা নজির হিসেবে গণ্য হলেই মানানসই হবে। নিজেকে কি বোঝাতে পারলাম? বুদ্ধের 'অগ্নিবিষয়ক উপদেশ-টি স্মরণে রেখেই কথাগুলো বলা। সবকিছুই পুড়ছে। যদিও আগুন দেখা যাচ্ছে না। তবে একসময় তা দৃশ্যমান হবেই। এবং আমিও একটি দাহর দিকেই ধাবমান। জিয়ো!

নবারুণ ভট্টাচার্য

সূচি


আগুনের মুখ ১১
পারিজাত ও বেবি কে ২৫
বেবি কে. ৩৩
অ্যামেরিকান পেট্রোম্যাক্স ৪৭
ফায়ার-ফাইট ৫৭
বেবি কে অ্যান্ড স্পাইডারম্যান পারিজাত ৭৯
বেবি কে, পারিজাত, পঙ্গপাল ও
মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ৯৭

# আগুনের মুখ

সত্তর দশকের গোড়ার দিকটায় আমার অস্তিত্বটাই একটা টালমাটালের সুরে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। সমুদ্রের ঢেউ ধাক্কা দেয়, কিন্তু সাইক্লোনের সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে ফেলে হয় চুরমার করে দেয় বা বেসামাল করে দিয়ে অন্ধ গভীরের ভেতরে টেনে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়টা ঘটলে, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের বাইরে এক ভারহীন ওলটপালটের মধ্যে চলে যেতে হয়। সেখানে, ওপরে ঝড় থাকলেও নিচে এক নিথর মর্গ। এই মর্গে ইঁদুর নেই। হাঙর আছে। হিসেবের ভুল না থাকলে সেটা ছিল ১৯৭২ সাল। কলকাতায় পুজো। অক্টোবর।

পুজো আসতে শুরু করলেই সবার মতো আমারও মনে হয় যে, অনেককিছু হবে কিন্তু শেষ অবধি বিশেষ কিছু হয় না। অনেকের আনন্দ, অনেকের দুঃখ দেখতে দেখাতেই কেটে যায়। আমি কখনওই সেই দলে পড়ি না, যারা কলকাতায় পুজোর অসহ্য ভিড়, প্রাণান্তকর যানজট ও অল্প বা সম্পূর্ণরূপে অমার্জিত মানুষদের সরব আনন্দ এবং মাইকের গানসহ ঝুলন্ত আলোর মেলা প্লেগের মতো মনে করে মহানগর ছেড়ে পালায়। চোট লাগা মোটরগাড়ির তোবড়ানো টিন হাতুড়ি পিটিয়ে ঠিক করার একনাগাড়ে আওয়াজ থেকে যারা ছন্দ শেখে

বা সঙ্গত করে একটা মুকেশের গান গাইতে পারে তারা ওসব ন্যাকামিকে ঘেন্না করে।

সেবার সত্যিই আমার হালটা ছিল শোচনীয়। সবদিক দিয়ে পর্যুদস্ত অপমানিত ও তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাতকাটা মানুষের জামার আস্তিনের মতো ফাঁকা পকেট। এখনও মনে পড়ে একটা সিগারেট কেনা বা এক পিঠের বাসভাড়া জোটানো কত কঠিন ছিল তখন। ব্যক্তিগত দুঃখ তো ছিলই। সারা বুকে সেলাই করা, যদিও আক্ষরিক অর্থে কেউ ছুরি মারেনি। এরকম একটা পুজোর তিনটে দিন কাটাবার পর সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ রাসবিহারী মোড় থেকে ডানদিকের ফুটপাথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে গড়িয়াহাটের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন গোলপার্কের দিক থেকে আসা [illegible]লেভার্দের শেষে গোটাদুয়েক পাবলি[illegible] আধখানা [illegible] দরজা লা[illegible] আমার [illegible]কে ফোন করা[illegible] [illegible]তেই শোনা যাচ্ছি[illegible] [illegible] শুভ বিজয়ার প্রী[illegible] শুভে[illegible] জানিয়েই চলেছে বিরামহীন। বাইরে থেকে ধুলোমাখা কাচের মধ্যে দিয়ে অপেক্ষারত, বিরক্ত কিছু মানুষ দেখছে জনৈক যুবক বার বার ডায়াল করছে কিন্তু নম্বর লাগছে না বলে ডান হাতের

দু আঙুলে ধরে রাখা কয়েনটাও ফেলছে না বরং শেকলে বাঁধা রিসিভার বার বার দেখে, আবার তুলে ডায়ালটোন ফিরিয়ে আনছে। আমি যে নম্বরগুলো তখন ছয় ডিডিটের ছিল, ডায়াল করছিলাম সেগুলোর কোনও মানে ছিল না। মানে ছিল ওই মেয়েটার গলায়। সেটাই ছিল সেদিনের ডায়ালটোন। সেই মেয়েটা কে ছিল যার গলায় বিজয়ার শুভেচ্ছা জানিয়েছিল ক্যালকাটা টেলিফোন্‌স? ১৯৭২ সালে? হ্যালো! কেউ বলতে পারবেন? বাইরে থেকে আমাকে যাঁরা দেখছিলেন এবং তিতিবিরক্ত হয়ে উঠছিলেন তাঁদের কারও কি মনে হয়েছিল যে উদ্ধত চেহারার যুবকটি ওই কাচের বাক্স ধরা পড়ে গেছে ও কোনওদিনও বেরোতে পারবে না? হ্যাঁ, আমিই ছিলাম সেদিন এক ভাগ্যহীন মহাকাশচারী যার পৃথিবীতে ফিরে আসার সম্ভাবনা ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে পড়ছিল, শুধু বেতার যোগাযোগে সে শুনতে পাচ্ছিল যে পৃথিবী থেকে একটি অনামা, অজানা মেয়ে যান্ত্রিকভাবে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়েই চলেছে!

ফুটপাথের ধারে দাঁড়িয়ে একটার পর একটা ভাসান দেখছিলাম। আলোর চলমান তোরণ। আলোর মুকুট মাথায় কালো কালো গরিব মানুষ। টেম্পো বা ম্যাটাডোরে চলন্ত ডিজেল

জেনারেটার। হ্যারিসন রোডের ব্যান্ড পার্টি। চিমসোনো গাল, খোঁচা খোঁচা দাড়িগোঁফ, শিরা ফুঁড়ে বেরোনো কপাল, ঘামের গর্জনতেলে চকচকে মুখ, টিউনিকের ওপর জরি, রাংতা, রিবন কেটে নকশা-বসানো, ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের ব্যান্ড, বেসুরো পিকলু বাঁশিতে সুরটি দেশাত্মবোধক, যাদের দেখলেই মনে হয় কুচকাওয়াজ করতে থাকা ছোটো ছোটো ফাসিস্ত, করোটিতে বিশেষ অনুরণন ধ্বনিত করে তোলা তাসা, পার্ক সার্কাসের বিশদ বস্তিতে এদের নিরন্তর মহলার আজ সুযোগ্য পরিণতি, বড়ো দুর্গাঠাকুরের জন্য একটা আলাদা ট্রাক, এরপরে এক একটি লরিতে দুটি ভাই ও দুটি বোন, ঢিমে গতিতে চলা সাদা অ্যাম্বাসাডার থেকে সুললিত মডেল কণ্ঠে ফিমেল ঘোষণা—কাদের পুজো, আপনাদের সেই বিজয়ার প্রীতি ও শুভেচ্ছা, রাস্তা জুড়ে বাওয়াল, বিটক্যাওড়াদের নাচ, বড়োলোকের লালু খোকাদের এক সন্ধেবেলার জন্য লুম্পেন সাজার আপ্রাণ চেষ্টা, সব পুজোতেই কিছু আধবুড়ো মাতব্বর থাকে এবং গোটা মিছিলটার দেখভাল করার জন্য তাদের হাঁকডাক এবং সব কিছুর পরে, বাঘ-ভালুকের খেলার পরে নেংটি ইঁদুরের নাচের মতোই অকিঞ্চিৎকর ঢাকি ও কাঁসর বাজানোর ঝলক, কলকাতায়

এভাবেই গেঁয়ো মানুষেরা আসে ও বাংলার ইজ্জত, বঙ্গসংস্কৃতির রোয়াব কায়েম করে ফের আফ্রিকাতে ফিরে যায় যা ফিবছরেই হয়ে থাকে, হয়ে আসছে।

এরই মধ্যে, এই ভাসানের উচ্ছল নদীর পাড়ভাঙা বন্যার তোড়ের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটেছিল। ছেলেটাকে আমি নজর করেছিলাম একটু আগেই। ব্যাপারটা যে আমার অজানা তা-ও নয়। ছেলেটা মুখে পেট্রল নিয়ে ভুস করে বাষ্পাকারে ছেড়ে তাতে সিগারেট ছুঁইয়ে দিয়ে দপ করে জ্বলে ওঠা ক্ষণস্থায়ী মশালের খেলা দেখাচ্ছিল। এই খেলাটার মধ্যে রয়েছে মলোটভ কলটেলের চাবিকাঠি যার বিশদ বিবরণ দেওয়া খুবই সহজ হলেও এখানে দেওয়া ঠিক হবে না। এই খেলাটারই আর একটা সামরিক ব্যবহার হল ফ্লেম থ্রোয়ার। গেঁয়ো ভুতেদের খড়ের চালের বাড়ি পুড়িয়ে দিতে এর জুড়ি নেই। মার্কিন সামরিক বাহিনীর দৌলতে এটা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল ভিয়েতনামীরা। কালো গেঞ্জি আর নীল প্যান্ট-পরা ছেলেটা তার সামনের আকাশে কখনও বানাচ্ছিল মলোটভ ককটেলের বিস্ফোরণ, কখনও ফ্লেম থ্রোয়ারের অগ্নিবর্ষী ড্রাগন। এবং সেই আগুনেই ঝলসে উঠছিল তার মুখ। আগুনের মুখ।

ঠিক যখন আমার সামনাসামনি তখন হঠাৎ দেখলাম ছেলেটা পেট্রল ছুঁতে গেল কিন্তু সিগারেট ধরা হাতটা উঠল না। মাথাটা দুপাশে অস্বাভাবিকভাবে ঝাঁকাচ্ছে যেন নিশ্বাস খুঁজছে। উন্মত্ত রণধ্বনি তাসা পার্টির। হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে নাচের একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠান যা অচিরেই পেছনের ঠেলা খেয়ে ফের চলতে শুরু করবে। এই হট্টগোলের মধ্যে থেকেই ছেলেটা ত্যারচাভাবে যেভাবে সাইডের দিকে দৌড়ে এল তার সঙ্গে গলাকাটা মুরগির ছটফটানির একটা মিল তো ছিলই। এত কাছে এল ছেলেটা যে, আমাকে যেন ধরেই ফেলবে। কিন্তু আমাকে নয়। চোখ ঝলসে গেলে লোক যেমন করে মাটির নিরাপত্তা খোঁজে সেরকম করেই সে নিচু হয়ে পড়ে রাস্তা হাতড়ে হাতড়ে নর্দমার জলে কয়েকবার থাবড়ে ফুটপাতের ধারটা বুঝে নিল, তারপর বসে পড়ল। মাথাটা সামনে ঝুলে। কাশছে, দম নিচ্ছে। ফের কাশছে। কিন্তু তাসার আওয়াজটা এত জোরে আর সেটাকে ঘিরে যে আওয়াজের পর আওয়াজের চক্কর পাক খাচ্ছে তার মধ্যে কাশির শব্দটা হারিয়ে যায়। যেমন আঙুলের ফাঁক থেকে কোন ফাঁকে সিগারেটটা নর্দমার জলে পড়ে ছ্যাঁক করে নিভে যায়, সেটাই বা কি করে জানা সম্ভব। তাসাটা এগোচ্ছে।

ছেলেটা দেখতে চেষ্টা করে কিন্তু কাশির দমকে কিছু দেখতে পায় না। আমিই বা কী করি! আমিও তখন ছেলেটার পাশে, ফুটপাথের ধারে বসে ছেলেটার পিঠে বেড় দিয়ে হাত রাখলাম, কয়েকবার চাপড়ালাম, হাত বোলাতে লাগলাম। ওর শিরদাঁড়ার গিট আর পাঁজরার হাড়গুলো টের পেলাম। হাত বোলাতে বোলাতে ওর ছটফটানি একটু কমল। আধবোঁজা চোখে আমাকে দেখল। চোখ দিয়ে জল বেরোচ্ছে। এটা কান্নার জল নয়। মুখ থেকে লালা ঝুলছে।

—গলায় পেট্রল চলে গেছে।

—এখন কথা বোলো না। জোরে জোরে নিশ্বাস নাও।

—মাথাটা হেভি ঘুরছে।

—কথা বোলো না। চুপ করে থাকো।

—আমি কিন্তু মালফাল খাইনি।

—ভালো করেছ। এবার চুপ করো। মুখটা হাঁ করে থাকো।

মাল তো খেয়েইছিল, বাংলা আর পেট্রল মিশে উদ্ভট একটা ঝাঁঝালো গন্ধ যার কোনও নাম দেওয়া যায় না। তৎক্ষণাৎ আমি ভাবতে চেষ্টা করলাম যে, গলায় বা পেটে পেট্রল চলে গেলে কী হতে পারে। পেট্রল আর অ্যালকোহল মিশলে কী হয়? পেট্রল কি বিষ? কিন্তু পেট্রল

খেয়েছে কেউ এমন তো শুনিনি। আমি যখন দুর্বোধ্য এই রসায়ন ও মানুষের ওপরে তার ফলিত প্রয়োগ নিয়ে ভাবতে চেষ্টা করছি তখনই ছেলেটা চিত হয়ে শুয়ে পড়ল। পকেট থেকে একটা চ্যাপটা পাঁইটের শিশি টেনে বার করল। পাশে ফেলে দিল শিশিটা।

—শালা পেট্রল। জানেই মেরে দিত। দাদা!

—বলো।

—একটু থাকবেন। যাবেন না। সব ঘুরচে। লাইট, ঘরবাড়ি, সব চক্কর দিচ্চে।

—আমি আছি। যাচ্ছি না।

ছেলেটা চোখ বন্ধ করল। কিন্তু বাঁহাত দিয়ে আমার শার্টটা খিমচে ধরে থাকল।

সামনে বিরাট প্রতিমা। তেমন বড়ো অসুর। অসুরের বুকে বর্শা যেখানে বিঁধেছে সেখানে আলোর একটা স্পার্ক জ্বলে জ্বলে উঠছে। লোকে হাঁ করে দেখছে। প্রতিমাটা এত উঁচু যে, রাসবিহারী মোড়ে যখন পৌঁছবে তখন বাঁশ দিয়ে ঠেলে ট্রামের তার উঁচু করতে হবে। যাদের ঠাকুরের জন্যে ট্রামের তার উঁচু করতে হয় বা গাছের ডাল ছাঁটতে হয় তাদের আলাদা রেলা। পাইপগান ও ওয়ান শটারদের মধ্যে যেমন এ. কে. ৪৭।

এবার ছেলেটা জোর করে উঠে বসল। বমি

করল। বমির মধ্যে খাবারের দলা। আলুর টুকরো। বমিটা নর্দমার জলে পড়েছে। তার ওপরে পড়েছে রং-বেরঙের আলো। তাই রঙিন। আবার মনে হল বমির মধ্যে তো পেট্রলও আছে। পেট্রল জলের ওপরে ভাসলে রঙিন দেখাবারই কথা। আমার শার্টটা ছাড়েনি। সেই খিমচে ধরে আছে।

—জামাটা ছাড়ো। আমি ওই চায়ের দোকানটা থেকে একটু জল নিয়ে আসি। বমি হয়ে ভালোই হয়েছে। কিন্তু মুখটা ধোওয়া দরকার।

—আপনি বস কিন্তু মাইরি চলে যাবেন না। ভয় লাগচে। পয়জন হয়ে যাবে না তো? মরে ফরে গেলে আমার মা পুরো একা হয়ে যাবে। জানি ক্লাবের ছেলেরা আচে। দেখলেন তো! আমি মাইনাস হয়ে গেলাম। শালারা চলে গেল।

—ওরা হয়তো খেয়ালই করেনি। আর মরা অত সোজা নয়, ওঠো। আমি হাঁটিয়ে নিয়ে যাব। সামনেই একটা টিউবওয়েল আছে। চলো।

—পারব?

—পারবে।

ছেলেটা দুবার পা ভেঙে নিচু হয়ে যায়। কিন্তু টলে টলে চলতে শুরু করে।

—গড়বড়িয়ে যাচ্ছে। বিষ তো!

—ও ঠিক হয়ে যাবে। পেট্রলে পয়জনিং হয় না। এই, সামলে...

একদিকে ঝুঁকে পড়ে ছেলেটা কী একটা যেন খোঁজে। গলায় হাত দেয়।

—লকেটটা। আমার গলায় বাঁধা লকেটটা!

—সুতোটা তো গলায় টান টান হয়ে আছে! বোধহয় পিঠের দিকে ঘুরে গেছে। দেখি। তাই। লকেটটা পিঠের দিকেই চলে গিয়েছিল।

—হেভি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। এটা পীরের। বাবা দিয়েছিল। বেঁচে থাকতে।

—কি করে মারা গেল?

—মেরে দিল। ইউনিয়ন করত তো। স্টাইকের টাইমে মেরে দিল। বোমচার্জ।

—কোথায়?

—ভারতিয়া ইস্টিল। জানেন তো! বাবা ছিল সনৎকাকুর দলে। লাল ঝাণ্ডা। চেনেন সনৎ কাকুকে?

—না।

—হেভি লোক। এখনও আসে। মাকে দু-দশ টাকা দিয়ে যায়। বহোৎ সাচ্চা আদমি। বলেচে পারলে কোথাও আমাকে কাজে ঢুকিয়ে দেবে।

—তুমি কী কাজ জানো?

—ওসব টুকটাক। ভালো নয়। গাড়ির বেটারির কাজ। আমাদের পাড়ায় বানায়। ওখানে

শিকচি। তো গরিবদের এরকম হয় জানেন? চলচে, ফিরচে, সব করচে, ফট করে শালা মরে গেল। আমি দেকেচি।

—তোমার মরতে অনেক দেরি আছে।

—কি করে জানলেন?

—বাচ্চা ছেলে। কয়েক মিনিট আগে নাচছিলে। এতে কেউ মরে না।

—আপনি মাইরি বস লোক আচেন।

—কেন?

—দেখলেন না! এত লোক, শালা কেউ সাহারা দিল?

টিউবওয়েলে মুখ ধুতে গিয়ে ও মাথাটাই ধুয়ে ফেলল। তারপর ভিজে মাথা, ভিজে গেঞ্জি, আধখানা ভিজেই গেছে। দাঁড়িয়ে উঠল, উঠে টিউবওয়েলের হাতলটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকল। হাওয়ার একটা ঝলক এল। হাসল।

—ভালো লাগচে। ফিট লাগচে। আমি যেতে পারব। ধরে ফেলব ওদের।

—দেখ, না পারলে আমি সঙ্গে যেতে পারি। মাথাফাথা যদি ঘুরে যায়।

—ঘুরবে না, কতদূর চলে গেছে ওরা মনে হয়?

—খুব বেশি দূর হবে না। এই দেশপ্রিয় বড়জোর। দেখ, আবার বলছি আমি কিন্তু যেতে

পারি।

—না বস। পুরো ফিট। আমি তা হলে যাই। একবার হাতটা মিলিয়ে নিই। আপডাউন কখনও আবার দেখা হয়ে যাবে।

আমি হাত মেলাই। হাসি। ওর কথার জবাব দিই না। ও চলতে শুরু করে। একটু ডাঁয়ে বাঁয়ে করছে। কিন্তু লোকের গায়ে ধাক্কা খায় না। ভিড়ের মধ্যে কালো গেঞ্জি আর নীল প্যান্ট আর আলাদা করে দেখা যায় না। ভাসান, ভাসান, ভাসান। রাত যত বাড়ছে তত ভাসানও বাড়ছে।

এরপরে আমি ফাঁকা ফাঁকা রাস্তা ধরে ধরে ফেরার পথে হাঁটতে শুরু করলাম। একটা সিগারেট কিনে ধরালাম। সব রাস্তায় পুজোর রোশনাই নেই। কত গলি অন্ধকার। রোজকার মতোই সেখানে টিমটিমে বাল্‌ব জ্বলছে। চারদিনের পুজো যে কেটে গেল এখানে দাঁড়িয়ে বোঝাই যাবে না। তবে দূর থেকে ভাসানের বাজনার রেশ শোনা যায়।

এরও পরে বছরের পর বছর, দশকের পরে দশক এবং শতাব্দীর পর শতাব্দীর কম আপডাউন আমায় করতে হয়নি। এখনও করছি। কিন্তু পেট্রল গলায় চলে যাওয়া সেই কালো গেঞ্জি, নীল প্যান্ট পরা গরিব ছেলেটার সঙ্গে কখনও আর দেখা হয়নি।

পারিজাত ও বে. বি কে

শীতের রাত। কলকাতা। পৌনে আট-টা-ফাট-টা হয়ে থাকবে। পেট্রল-ডিজেল পোড়া ধোঁয়া, ফ্লাইং ধুলো, চাটুতে রোলের পরোটা সেঁকার গন্ধ—সব মিলে মিশে হাল্লাক। মাঝ ডিসেম্বরেও কলকাতায় ঠান্ডা নেই। অথচ চক চক করছে লেদার জ্যাকেট আর উইন্ডচিটার, মেয়েদের পায়ে স্কিন কালারের মোজা। ফি-বারই শীতের কলকাতায় এই টাইপের হুলিয়া হয়ে থাকে। যাই হোক, যে টাইমটা আমরা বলেছি, তখন পারিজাত নামে একটা মোটা মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটিভ তার হালকা মোপেডে তেল ভরার জন্যে একটা পেট্রলপাম্প খুঁজতে লাগল। কথাটা ঠিক হলো না, কারণ—এ এলাকার পেট্রলপাম্পগুলো তার চেনা। এতক্ষণ সে একটা ফ্লাইং ছুকরি খুঁজছিল। চক্কর মারছিল। যে চেনা বাসস্টপগুলোতে রোজই মেয়ে দাঁড়ায় সেগুলোর কাছে এসে মোপেড স্লো করছিল। লে! মালগুলোর আজ হলো কি? হয়তো ছিল। একটু আগেই হয়তো ছিল। গাড়ির ভেতরে বা বাইকের পেছনে উঠে গেছে। মোপেড সাইডে ভেড়ালো পারিজাত। পায়ের কাছে রাখা ব্যাগটা খুলে রামের নিপটা বের করে ছোট একটা চুমুক মারল। বুকপকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করল। ধরিয়ে একটু ধাতস্থ হয়ে গাড়ি

স্টার্ট করতে গিয়ে দেখল তেল নিতে হবে। তবে এখনও দশ কিলোমিটার ইজি টেনে নেবে মোপেড। এই সময় একটা বাইক পাশে এসে দাঁড়াল। ছোকরা রোগা, তায় মাথায় পরেছে হেলমেট। পেছনে পিৎজার বাক্স বসানো।

—দদ্দা, আরামবাগ ফুড মার্ট-টা জানেন?

—জানব না কেন? স্ট্রেট চলে যান। ডানদিকে পড়বে।

—থ্যাঙ্কস।

চিমড়ে চলে গেল। এবং বিনা কারণেই পারিজাত বিড়-বিড় করে উঠল,

—গাড্ডু নাম্বার ওয়ান, আবার থ্যাঙ্কস মারাচ্ছে।

মোপেড স্টার্ট দিল পারিজাত। একটু এগোলেই 'পিওর ফর শিওর'।

—কিন্তু মাগ্‌গুলোর আজ কি হলো? অন্যদিন তো কত দেখা যায়! আজব কেস মাইরি!

নিট মালটা মেরে একটু গরম লাগছে। লাগবেই। এ তো আর শালা স্টেশন রোডের টররা নয়। পিওর ওল্ড মংক্। ওফ নিপ বেরিয়ে মাল খাওয়ার মজাটাই পাল্টে গেছে। সাটাসাট মেরে দাও। বিন্দাস!

## পেট্রলপাম্প

পেট্রলপাম্পে যখন ঢুকেছিল পারিজাত তখন ওর সামনেই বেবি কে, পেট্রল খাচ্ছিল। পারিজাতের চোখ তার ওপরে পড়ে একটু পরে। স্কাই ব্লু সালোয়ার কামিজ পরা নাটকা মেয়েটা হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে আর পেট্রল দেবার নলটা মেয়েটার মুখে ঢুকিয়ে ট্রিগার চেপে আছে একটা লোক। লোকটা মিটারে চোখ রাখছিল। ৪.৯৭.৮৯.৯৯—পাঁচ লিটারে মিটারটা থেমে গেল। ট্রিগার আলগা করে দিয়েছিল লোকটা। তারপর মেয়েটার মুখ থেকে নলটা বের করে নিল। পারিজাতকে লোকটা বলল মোপেড এগোতে। মেয়েটা নিজের বুকে হাত ঢুকিয়ে টাকা বের করেছিল। দাম দিয়েছিল খাওয়া পাঁচ লিটার পেট্রলের। তারপর ওড়নাটা, যেটা এতক্ষণ হাতে ধরা ছিল, গলায় আলগা জড়িয়ে নিয়েছিল। তারপর হেঁটে বেরিয়ে গিয়েছিল।

পারিজাত পেট্রল পাম্পের লোকটাকে বলল,

—মেয়েটা পেট্রল খায়?

—রোজ, পাঁচ লিটার করে বাঁধা। খাবে। দাম চুকিয়ে দেবে। চলে ভি যাবে। কোনও ঝামেলা নেই।

—রোজ আসে?

—এদিকটায় থাকলে আমাদের পাম্পে আসে। অন্য মহল্লা হলে সেখানে খেয়ে নেবে। পেট্রল ও খাবেই। আপনি ওর নাম শুনেননি? হেভি পপুলার।

—কি নাম ওর?

—বেবি কে...। আসলে বেবি খানকি। বেবি কে. বললেই সবাই বুঝে লিবে। লালবাজার ফালবাজার সব। ও যখন কথা বলবে দেখবেন ওর জিভে নীল লাইট হলকাবে।

ঝপাঝপ তেল ভরে ঘ্যারঘেরে, হালকা, সস্তার মোপেড স্টার্ট দিয়ে পারিজাত বেরিয়ে এসেছিল। ওই ওই তো উল্টে ফুটে বেবি কে.। কিন্তু সোজা গিয়ে অনেকটা তবে মোপেড রাইট-টার্ন নিতে পারবে। রাইট-টার্ন নিতে নিতেই পারিজাত দেখেছিল যে, বেবি কে. একটা টয়োটা কোয়ালিসে উঠে যাচ্ছে। কোথায় টয়োটা কোয়লিসের পিক-আপ আর কোথায় ঝ্যাড়ঝেড়ে মোপেড! মোপেডকে ওভারটেক করে ইয়ামাহা বাইক। হন্‌ডা অ্যাকর্ড, অল্টো, টাটা সুমো....

## পারিজাত

এই ঘটনার পরদিন সন্ধে থেকে পারিজাত একটার পর একটা পেট্রলপাম্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হয় বেবি কে. আসেনি সেখানে, নয়তো একটু আগেই পাঁচ লিটার পেট্রল খেয়ে দাম নগদ

মিটিয়ে দিয়ে চলে গেছে। জিভে নীল হল্‌কা। সে তো কথা বললে সবাই দেখতে পায়। হয়তো আজ এ তল্লাটে নেই!

পারিজাত তার মোপেড নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে। কিন্তু বেবি কে-র সঙ্গে তার দেখা হচ্ছে না। এর বেশি কিছু কেউ জানে না। আমাদেরও কিছু করার নেই এ ব্যাপারে। কাজেই বেকার ভাটিয়ে কোনও লাভ আছে?

বে বি কে.

এই গল্পটি আমার অন্য একটি গল্পের ক্লোন নয়। সেই গল্পটির একটি ছোট পিস জানা থাকলেই তোফা হবে। 'পেট্রল পাম্পে যখন ঢুকেছিল পারিজাত তখন ওর সামনেই বেবি কে পেট্রল খাচ্ছিল। পারিজাতের চোখ তার ওপরে পড়ে একটু পরে। স্কাই ব্লু সালোয়ার কামিজড পরা নাট্‌কা মেয়েটা হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে আর পেট্রল দেবার নলটা মেয়েটার মুখে ঢুকিয়ে ট্রিগার চেপে আছে একটা লোক। লোকটা মিটারে চোখ রাখছিল। ৪.৯৭. ৯৮.৯৯— পাঁচ লিটারে মিটারটা থেমে গেল।' ওই গল্পটির শেষে পড়ানো হয়েছিল যে, বেবি কে... বা বেবি খানকি, যে খদ্দের মজানোর ফাঁকে-ফাঁকে পেট্রল দিয়ে ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ (কখনও কখনও ব্রাঞ্চ) ও ডিনার সারে, তাকে দেখে মোপেড-আরোহী পারিজাত বেয়াড়া রকমের গরমে যায়। কিন্তু এমনই বন্দোবস্ত ছিল যে ট্রাফিক লাইটে দাঁড়ানো একটা টয়োটা কোয়ালিস-এ উঠে বেবি কে. ধাঁ এবং হোঁৎকা, ঘেমো পারিজাত তাজ্জব হয়ে তার মোপেডের সঙ্গে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। স্টোরি মানে রাদার ভেরি সিম্পল ওই স্টোরিটা এই অজুহাতে সহসা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল যে যে হেতু এর পরে কী হয়েছিল তা জানা নেই, তাই

ব্রয়লারের কঁক কঁক-এর মতো ফালতু ভাটিয়ে লাভ নেই। অবশ্য এর মানে কখনওই এমন নয় যে ফালতু ভাটিয়ে কোনও স্টোরি হয় না, বা হবে না। বরং উল্‌টোটাই হয়তো সত্যি! ব্রয়লার কঁক কঁক করে বলেই আরামবাগের তাজা মুরগির মজা সম্বন্ধে বাঙালি আজ প্রচুর নলেজ যোগাড় করে ফেলেছে।

## ফায়ারম্যান! ফায়ারম্যান!

কিছুদিন আগে কাগজে 'ফায়ারম্যান', নিয়ে যে খবর বেরিয়েছিল তাতে যার কথা বলা হয়েছিল সে আগুনে গোলা ছুড়ে গেরস্তের ঘরে আগুন লাগাচ্ছিল। আমরা যে ফায়ারম্যানের কথা বলছি তার কাজ আগুন নেভানো। সে ফায়ার বিগ্রেডে কাজ করে। গরচা-র বাংলুর ঠেকে তার সঙ্গে পারিজাতের আলাপ ও দোস্তি। যাই হোক, পারিজাত তখন একেবারে ডেসপারেট হয়ে পেট্রলপাম্প টু পেট্রলপাম্প বেবি কে.-র জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে— সেরকম টাইমে, ওই গরচা-র ঠেকেই পারিজাত বেবি কে. সম্বন্ধে ফায়ারম্যানকে বলেছিল। ফায়ারম্যানের ইয়া বডি, কালো ও মুশকো। অতবড় সাইজের গাম্বাট লোকটা। স্ট্রেট ঘাবড়ে গেল।

—বলো কি? খানকি! পেট্রল খায়? মানে বলছ ভাত-ফাত খায় না!

—নিজের চোখে দেখলুম! পাঁচ লিটার পেট্রল সাঁটিয়ে ফেলে গেল। নাট্‌কা টাইপের। কিন্তু কী বডি!

—আমি ভাবছি অন্যকথা! মলোটিভ-ককটেল কাকে বলে জানো তো, পেট্রলের বোমা, মালটা বোতলে ভরা থাকে, মুখে সলতে। সেই টাইপের কিছু নয় তো?

—কি জানি! ভয়ের কিছু আছে?

—আছে মানে! ডেঞ্জারাস।

—হোক গে! আমার ওকে চাই। বেবি কে.!

—সে তুমি যা ইচ্ছে করো। আমি ফায়ারম্যান। আগুন-ফাগুন লেগে যাওয়ার রিস্ক আছে। বলে দিলাম।

—আর একটা পাঁট আনব?

—আনবে? আনো।

পারিজাত পাঁইট আনতে গেল। ফায়ারম্যান আপনমনে বলতে লাগল,

—শালা পুলিশ জ্যোতি বোসের এ.টি.এম কার্ড ঝেড়ে দিচ্ছে। এখন আবার শুনছি পেট্রলখেকো খানকি! কী হুজ্জুতি মাইরি!

পারিজাত পাঁইট নিয়ে ফিরে এল। পাঁইট খতম হল। এবারে ফায়ারম্যান গেল পাঁইট

আনতে। পারিজাত আপনমনে বলতে লাগল,

—অনেক দিন ঘর-সংসার করেচি। করে দেখেচি একেবারে ফালতু। বেবি কে.-কে আমার চাই। যে করে হোক... লোটোতে মাল লড়িয়েছি। লাগেনি। কিন্তু বেবি কে.—তোমার জন্যে এই পারিজাত, মাল তো ফালতু, জান লড়িয়ে দেবে।

ফারারম্যান যে চলে এসেছে সেটা খেয়াল ছিল না পারিজাতের। আলফাল বকবক করে যাচ্ছিল। ফায়ারম্যানের আঙুলের খোঁচায় হুঁশ ফিরল।

—এলুম। দুটো গেলাসে ঢাললুম। স্টার্ট করে দিলুম। দেখছি তোমার ঘোরই কাটছে না!

—হুঁ।

—এসব হুঁ হাঁ ছাড়ো। বুঝতেই পারছি খানিকটা তোমার মনে একদম সিল হয়ে রয়েছে। এরকম ভালো নয়। ভুগবে। খানকির ফেরে পড়লে রেজাল্ট ভালো হয় না। এসব শোনা কথা নয়। নিজে দেখেছি। সংসারে এমন ফায়ার লেগে যাবে যে দশটা ইঞ্জিনও নেবাতে পারবে না।

—কোথায় দেকেচো?

—কোথায় আবার। বাড়িতে। বাপের ওই দোষ ছিল।

পারিজাত কথা ঘোরায়।

—হাওড়া ব্রিজে নাকি মাঝে মধ্যে একটা করে পাগলা উঠে পড়ে।

—পড়ে তো। আমরাই তো নামাই। আমাদেরও বাঞ্চোৎগুলোকে নামাতে চড়তে হয় হয়।

—তারপর?

—তারপর আবার কী? বিড়ি খাওয়াই। বাবা-বাছা করি। তারপর ঘ্যাঁক্। হেভি রিস্কি কাজ। কামড়ে ফামড়ে দিলে আর দেখতে হবে না!

—নতুন পুলটাতেও ওঠে?

—এখনও ওঠেনি। চান্স কম। এমনভাবে মালটা বানিয়েছে যে পা রাখার জায়গা পাবে না। একটু চড়লো হয়তো, তারপরই স্লিপ করে নেমে আসবে।

—আমার কী মনে হচ্ছে জানো তো?

—কী?

—আমি নতুন পুলটার একেবারে টঙে উঠে গেচি। টঙে দাঁড়িয়ে খিস্তি করচি, মুতচি, কিন্তু কোন শালা আমাকে নামাবে? হ্যায় কোই নামানেওয়ালা? কোই হ্যায়?

শেষ দিকটায় পারিজাত চিল্লোতে থাকে। আশপাশের লোকরা পারিজাতকে দেখে। কেউ ফায়ারম্যানকে বলে,

—বাড়ি নিয়ে যান। বেকার বাওয়াল! মালের বদনাম।

ফায়ারম্যান অপ্রস্তুত হয়। ওরা টলমল করতে করতে বেরোয়।

—পারবে গাড়ি চালাতে?

—একবার স্টার্ট হয়ে গেলেই দেখবে ফিট। তুমি বলো তো একন কোতায় যাব?

—কেন বাড়ি?

—ধুস... একন পেট্রলপাম্পে পেট্রলপাম্পে চক্কোর মারব। বেবি কে...

ফায়ারম্যান দাঁড়িয়ে থাকে। মোপেড স্টার্ট দিয়ে একটু ডাঁয়া-বাঁয়া করে, তারপর স্ট্রেট বেরিয়ে যায়। ফারাম্যান ভাবল যে কাল থেকে আবার তার নাইট ডিউটি। ভারী ভারী পা ফেলে সে গরচার মোতা-গলি ছেড়ে বালিগঞ্জ ফাঁড়ির দিকে। তার জাঁদরেল হাঁটার স্টাইলটা দেখে লোকাল কিছু ফালতু মাস্তান ঘাবড়ে গিয়ে ভাবল প্লেন ড্রেসে পুলিশ। বাড়ি ফিরে ফায়ারম্যান দেখল তার মা, বউ, মেয়ে, ভাই, ভাই-এর বউ— সকলে গ্যাঁট হয়ে জি-সিনেমাতে 'মিস্টার অ্যান্ড মিসেস খিলাড়ি' দেখছে। কলতলায় গিয়ে পা ধুতে ধুতে ফায়ারম্যান ভাবল, রোজ যেমন নতুন নতুন মাল বেরোচ্ছে—যেমন সেলফোনে ক্যামেরা, ডিভিডি, হোম থিয়েটার

তেমন নতুন নতুন টাইপের খানকিও বাজারে নামছে। আর কী তাজ্জব কারবার যে পারিজাতই তাদের একটার জন্যে হামলে মরছে ঘরে জলজ্যান্ত বউ থাকতে! ফায়ারম্যান তার নিজের ঘরে গিয়ে বসে তার পোষা কেঁদো হুলোকে আদর করতে লাগল। দেওয়ালে শুকনো মালাপরা ফটো। ফায়ারম্যানের বাবার। তাঁর ছেলে না পারলেও ছেলের বন্ধু পারিজাত তাঁর পথে এগোতে বদ্ধপরিকর। এই জন্যেই কি ফটোতে যে থোবড়াটা রয়েছে সেটা হাসি হাসি?

## পারিজাতের খেল

পারিজাত যে দিশি ওষুধ কোম্পানির মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ তারা যে ওষুধ বানায় তা টেকনিক্যাল জালি না হলেও প্রায় ওই গোছেরই। টনিক আর কাশির ওষুধ বলে যে মালগুলো ওদের কলকাতার বাইরে রমরমিয়ে চলে সেগুলোতে শরীর ভালো তো হয়ই না, কাশিও সারে না। কিন্তু রাশিয়ানদের ভদকা খাওয়ার স্টাইলে কেউ যদি বটম্-আপ্ করে এক শিশি নিট মেরে দেয় তা হলে তার উদোম ঝিম ধরবে। অ্যালজোলামের বড়ি ফেলে দিলে তো ধুমা! এরকম ওষুধের কোম্পানির মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভের সঙ্গে কেমন ডাক্তারদের

দহরম-মহরম তা আন্দাজ করা ভেরি ইজি। সে রকমই একটা হারামি ডাক্তারের চেম্বারে ওয়েট করছিল পারিজাত। ডাক্তারটা চিমড়ে, ওরকম দেখতে সচরাচর পেটিকেসের উকিলদেরই হয়। যাইহোক, ডাক্তারটা পারিজাতকে যা বলল তা শোনার জন্যেই পারিজাতের জন্ম হয়েছিল। ডাক্তার বলেছিল, ঘড়ি দেখতে দেখতে,

—ভেরি পাংচুয়াল। আর মাত্র দশ মিনিট। একজন ভেরি স্পেশাল ফিমেল পেশেন্ট আসবে। দেখে নিয়ে চলে যাও। এরকম চান্স পাবে না।

—ফিল্মস্টার? সিরিয়াল-ফিরিয়াল করে?

—নো!

—তা হলে কোনও সিঙ্গার? না হলে মডেল?

—তাও না।

—তবে?

—খানকি। তবে নো অর্ডিনারি খানকি। ভেরি স্পেশাল। হার ওনলি ফুড ইজ পেট্রল। পারিজাত চিৎকার করে উঠেছিল, বেবি কে.?

—ড্যাম্ রাইট ইউ আর। শি ইজ দা ওয়ান অ্যান্ড ওনলি বেবি কে.।

একটা মাইনর কমপ্লিকেশন নিয়ে বেবি কে. ডাক্তারের কাছে এসেছিল। পায়ে হাজা। ডাক্তার প্রেসক্রাইব করলেন মুগুর-মার্কা হাওয়াই চটি

অ্যান্ড একটি মলম। বেবি কে. বেরিয়ে এল। পারিজাত ভার্চুয়ালি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। দরদাম নিয়ে ব্রয়লার সুলভ কঁক্ কঁক্ হল। এই স্টোরিটা যদি দস্যু মোহন সিরিজের হতো তা হলে বলাই যেত যে 'কী করিয়া কী হইয়া গেল কিছুই বোঝা গেল না' কিন্তু দেখা গেল যে ঝ্যাড়ঝেড়ে মোপেডের পেছনে বসে, রমা নয়, বেবি কে., এবং মোপেডটি চালাচ্ছে মোপেডের মালিক পারিজাত। অর্থাৎ কী করে কী হল সবই বোঝা গেল।

## সব খেল-ই খতম হয়

সেই ঐতিহাসিক রাতে পারিজাতের পেট্রলে চলা খাজা মোপেড যদি কোনও স্পেশাল ম্যাজিক ট্রিকে এ-রাস্তা ও-রাস্তা দিয়ে, নানা টাইপের খাৎরা পার হয়ে, অকুপায়েড বাগদাদে পৌঁছে যেতে পারত তা হলে, কোনও সন্দেহই নেই যে, জব্বর একটা জমকালো ঘটনা ঘটত। এই ম্যাজিকটির পেছনে একটি নির্ভুল লজিকও আছে। বুশ পেট্রল চায় বলে সে বাগদাদে গেছে। বেবি কে. পেট্রল খায় বলে সে তো বাগদাদে যেতেই পারে। বুশের বাগদাদে যাওয়ায় অ্যামেরিকান সৈন্যদের যে ভূমিকা বেবি কে.র বাগদাদে যাওয়াতে সেই একই ভূমিকা পারিজাতের।

পারিজাতের মোপেড যখন, গভীর রাতে, বাগদাদে ঢুকবে তখনই ইরাকি গেরিলারা একটি এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস ফাটিয়েছে, যার ফলে অ্যামেরিকান একটি হামভি গাড় জ্বলছে এবং প্রবল প্যানিকে দিশেহারা হয়ে অ্যামেরিকান সেনারা এলোপাথাড়ি গুলি চালাচ্ছে। তখন একটা স্ট্রে-বুলেট লেগে পারিজাত অক্কা পেতে পারত। পেলে ভালোই হতো কিন্তু সেটা হয়নি। আর একটা রোমাঞ্চকর সম্ভাবনা হল, মোপেডের ওপরে বেবি কে.-কে দেখে অ্যামেরিকান সৈন্যদের বিস্তর পুলক জেগে উঠতে পারে। এবং বেবি কে.র মুখে একটা লাকি স্ট্রাইক বা ক্যামেল সিগারেট গুঁজে দিয়ে তারা লাইটারও ঠুকে দিতে পারে। সেটা করলে যে মারাত্মক ভুল হয়ে যাবে সেটা অ্যামেরিকানদের জানার কথা নয়। আর এটা কোনও সিক্রেট তথ্য নয় যে মারাত্মক ভুল করায় অ্যামেরিকানদের জুড়ি মেলা ভার। লাইটারের আগুন সিগারেটের ভেতর দিয়ে বেবি কে.-র এল পি জি নিশ্বাসে পৌঁছে যাবে এবং তখন পুরো বেবি কে. একটা মানুষ মাপের মলোটভ-ককটেল হয়ে ফাটবে। এটা হলে যে স্পেকটাকুলার একটা দৃশ্য হত তাতে কোনও দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু সেটাও হয়নি।

সেই ঐতিহাসিক রাতে পারিজাতের মোপেড

বাগদাদে পৌঁছতে পারেনি। ফাক্ ইউ, পারিজাত। পারিজাতের মোপেড পৌঁছেছিল বাঘাযতীনে একটি একতলা বাড়িতে। পারিজাত সেখানে সকাল অব্দি ছিল।

সেই রাতে গরচার ঠেক থেকে বেরোতে বেরোতে পারিজাত ফায়ারম্যানকে বলেছিল,

—সারা গা যেন ফোস্কা পড়ে জ্বলছে! ভেতরেও জ্বলছে। জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে।

—আমি তখনই সাবধান করেছিলুম। বডিতে পেট্রল ঢুকে গেছে। কিছু করার নেই।

—তা হলে কী হবে?

—কী আবার হবে! জ্বলবে।

ফায়ারম্যান ভারী পা ফেলে ফেলে চলে গিয়েছিল। পারিজাত ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বেকার পিছু ডেকেছিল,

—ফায়ারম্যান! ফায়ারম্যান!

# অ্যামেরিকান পেট্রোম্যাক্স

সাইড দিয়ে দেখা যাচ্ছে ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে নানা মডেল ও সাইজের গাড়ি চলছে যার মধ্যে মাঝেমধ্যে মড়ার গাড়ি ও পুলিশভ্যানও দেখা যায়। এই নন-স্টপ যাওয়া দেখার ফাঁকে হঠাৎ ক্যাঁ-ক্যাঁ করতে করতে একটা মোপেড গেল। অবশ্যই অন্যদের তুলনায় স্লো। রঙচটা হেলমেট, ঝাপড়া-খাওয়া উইন্ডচিটার, মোটালো গড়ন—বলা যায় না সেটাই হয়তো পারিজাত। পারিজাত বউ-পরিবার সব ছেড়েছুড়ে বেবি কে, অর্থাৎ বেবি খানকির সঙ্গে লিভ টুগেদার করছে। গরচা-র বাংলার ঠেকের বন্ধু ফায়ারম্যানের সদুপদেশ তাকে ঠেকাতে পারেনি। পারিজাতের শিরায়, নার্ভে, নানা মাপের সরু মোটা নলে পেট্রল ঢুকে গেছে। গা-হাত-পা জ্বলে। ডাক্তার বলেছিল, দেখবেন, লিভ টুগেদার মারাতে গিয়ে ডাই টুগেদার না হয়ে যায়। পারিজাত কানে তোলেনি। জেরিক্যান নিয়ে সে পাম্প থেকে পেট্রল কিনে আনে। দাম বাড়ছে। বেবি খানকি দিনে তিনবার থেকে চারবার এক এক পক্কড়ে পাঁচ লিটার করে পেট্রল খায়। পারিজাত কখনও রাইস হোটেল, কখনও তড়কা-রুটি। পেট্রলের গ্যাসে লিভ টুগেদারের ঘর ম ম করে। আগুন জ্বালা অসম্ভব।

গরচার ঠেকে শেষ যেবার ফায়ারম্যানের

সঙ্গে তক্তপোশের ওপরে বাস মাল খেয়েছিল পারিজাত, তখন সন্ধের মুখ, ঘপ করে লোডশেডিং হয়ে গেল। আলোটা চলে যাবার আগে ফায়ারম্যান বলছিল,

—ঘরবাড়ি, বউ-বাচ্চা, মায় পোষা হুলোটা অবদি তোমার বেবি কে-র জন্য বরবাদ করে দিলে! পই পই করে বললাম। শুনলে না।

পারিজাত চুপ। থোবড়াতে একটা ট্রাজিক ছায়া, কুঁকড়ে কোলকুঁজো হয়ে বসে আছে; ফায়ারম্যান সিগারেট ধরাতে ঘাবড়ে গিয়েছিল।

—ঘাবড়িও না। আমি ফায়ারম্যান। আগুন নেভানোটা আমার কাজ, জ্বালানো নয়।

—জানি কিন্তু ভয় করে। অনেক দেশলাই দেখবে ঠুকলে জ্বলন্ত বারুদ ছিটকোয়। ধরো একটা ফুলকি ছিটকে এল। নিশ্বাসে লাগলেই তো ধরে নেবে।

—সেই জন্যেই তো কাঠি ঠোকার অ্যাঙ্গেলটা বাইরের দিকে রাখলাম। আমি ভাবছি অন্য কথা।

—কী?

—গুলিয়ে গেল। আর একটু খাবে? একটা পাঁট আনব?

—আনো। ভেতরে একটা অদ্ভুত কেস হচ্ছে। মাথার মধ্যে বাওয়াল চলছে।

—মগজে একই সঙ্গে পেট্রল আর

অ্যালকোহল। বাওয়া তো হবেই।

লোডশেডিং। অন্ধকারটা অল্প ধাতস্থ হতে একটু দূরে, একটা নেপালি ছেলে একটা হ্যাজাক জ্বালাচ্ছিল। সেটাই দেখছিল পারিজাত। পাম্প করলেই আগুনটা ভ্যাস করে বেরিয়ে আসছে, ফের ঢুকে যাচ্ছে। পাঁট নিয়ে ফারারম্যান ব্যাক করল। একেই বিরাট চেহারা। আলো-ছায়াতে আরও বড়ো দেখাচ্ছে। হ্যাজাকটা স্টেডি হতে সেই আলোতে ফায়ারম্যান দেখল পারিজাত কাঁদছে। অল্প ফুঁপিয়ে। পারিজাত ভেবেছিল ফায়ারম্যান কিছু বলবে। ফায়ারম্যান দুটো গেলাসে হাফাহাফি পাঁট ঢালে। জল অ্যাড করল। দুটো বাদাম মুখে ফেলল। এবং এত কিছুর ফাঁকে বার বার হ্যাজাকের ভেতরে যে আগুনটা সাঁ সাঁ করছিল সেই দিকে দেখছিল।

—কি হল? চুপ মেরে গেলে।

ফায়ারম্যান পারিজাতের দিকে তাকাল। মুখে সামান্য হাসি, বাকিটা আরাম।

—হ্যাজাকটা দেখে একটা কথা মনে পড়ে গেল। ছোটোবেলা মামাবাড়ির উঠোনে কালীপুজো। মেজমামা উবু হয়ে হ্যাজাক জ্বালছে আর মুখে মালের গন্ধ নিয়ে আমাকে কোলে নিয়ে দাদু বলছে, 'এই হ্যাজাক হল গে তোর অ্যামেরিকান আর্মির মাল। এলি তেলি নয়। যুদ্ধের

বাজারে এসেছিল। একেবারে খোদ অ্যামেরিকান পেট্রোম্যাক্স। আলোর কী রোয়াব দেখেছিস!'

পারিজাত ও বেবি কে-র গল্পটা কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কলকাতার একটি প্রায় অজানা ঘটনার ঐতিহাসিক পুনরাবৃত্তি হয়ে লিপিবদ্ধ থেকে গেল। এর মধ্যে কোনটা ট্র্যাজেডি, কোনটা ফার্স, সে নিয়ে কোনও মন্তব্য নেই। দুটি ঘটনার শেষটা একরকমও নয়। প্রথমটা হল এই— সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের এক কালোবাজারি সন্ধেবেলায় ক্ষীণ এক বাঙালি কবি তার বউকে নিয়ে চৌরঙ্গির ফুটপাথে বেড়াচ্ছিল। বউটিও লঘুতনু। এমন সময় কয়েকজন অ্যামেরিকান সোলজার, হোয়াইট না ব্ল্যাক জানা নেই, বউটাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে কোনও গলতায় ঢুকে পড়ে। বাঙালি কবিটি হাঁউমাউ করতে করতে, ভাগ্য ভালো, ইউ.এস. আর্মিরই কয়েকজন এম.পি অর্থাৎ মিলিটারি পুলিশের দেখা পেয়ে যায় এবং তারাই গিয়ে মুহ্যমান বউটিকে রেস্কিউ করে। ঘটনাটি অন্যরকম হলে বাংলা কবিতার ইতিহাস যে অন্যরকম হত তাতে ওয়াকিবহাল মহল নিঃসন্দেহ। সেই ঘটনাই, হুবহু না হলেও ২০০৭/৮/৯... তে ঘটে গেল। ইরাক ও উত্তর কোরিয়ার দিকে যাওয়ার রাস্তায় ইউ.এস.আর্মির কিছু সৈন্য কলকাতায়

কিছুদিন ছিল। চৌরঙ্গি এলাকার পানশালা ও অন্যান্য মস্তির ঠেকগুলো স্বাভাবিকভাবেই তাদের হুল্লোড়ের দখলে চলে গেল।

সেই আবদেরে সন্ধেবেলায় পুরো চৌরঙ্গি এলাকাটাই সেক্সি একটা আমেজে ম ম করছিল। এবং পারিজাত ও বেবি কে এক হাফপ্যান্ট ও স্যান্ডো গেঞ্জি পরা এক চোখ কানা একটা চিনেম্যানের দোকানে মোমো খেয়ে মহানন্দে মেট্রোর সামনে দিয়ে টাইগারের দিকে এগোচ্ছিল। ফুটপাথে বিক্রি হচ্ছিল ইউ.এস.আর্মির খাকি জাঙ্গিয়া, ডিলডো, ছোটো হেভি কিউট ডাইনোসরের বাচ্চা ও তোড়া করে বাঁধা রডোডেনড্রনগুচ্ছ। আকাশে চাঁদ ধরার খ্যাপলা মেঘ, মিলিটারি ট্রান্সপোর্ট প্লেনের ভারী আওয়াজ ও বুড়ো চামচিকেদের হিজিবিজি ফ্লাইট। বেবি কে-কে পারিজাত বলল,

—কেমন লাগল মো মো?

—টেস্টি!

—চা খাবে?

—না।

—আমি খাব।

—সে খেয়ে যাও। আমি খাব পেট্রল।

ডায়লগটার একটা ভায়োলেন্ট ব্রেক হয়ে গেল কারণ এই সময়েই দুটি ব্ল্যাক ও একটি

হোয়াইট জি. আই—তিনটেই জায়েন্ট সাইজের—বাস্কেটবল খেলার স্টাইলে পারিজাতকে একটা চুপকি মারল, পারিজাত ফলস খেয়ে রাস্তায় কেলিয়ে পড়ল এবং ওরা পাঁজাকোলা করে বেবি কে-কে তুলে সাইডের একটা গলতায় ভ্যানিশ করে গেল যেটা ছিল একটা খচ্চরমার্কা বার। ওরা ঢুকতেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল ধড়াম। পারিজাত দুমদাম দরজা ধাক্কাল। ভারী দরজার পেছনে আওয়াজ গেল কি না বোঝা গেল না। পারিজাত হাঁউমাউ করে লোক ডাকতে লাগল। কেউ পাত্তাই দিল না। পারিজাতের ফেঁসে যাওয়া আর্তচিৎকার ইউ.এস. আর্মির হামভি গাড়ির আওয়াজে চাপা পড়ে গেল।

ভেতরে তখন বেবি খানকিকে ওরা তিনজন প্লাস আরও ৩৪ জন ইউ এস আর্মির সোলজার হুইস্কি খাইয়ে টেবিলের ওপর তুলে দিয়েছে। উদ্দাম মিউজিক। টেবিলের ওপরে বেবি খানকি নাচছে, তলায় ৩৭ জন সোলজারও নাচছে, ক্ল্যাপ দিচ্ছে, ফাক্ হার! ফাক্ হার! বলে চেঁচাচ্ছে—অনেকটা ঝুমা চুমা দে দে, ঝুমা চুমা দে দে চুমা-র মতো। এরকমই চলত কিন্তু একজন সোলজার, তড়াক করে বেবি খানকির টেবিলে উঠে বেবি খানকির ঠোঁটে একটা কিং সাইজ মার্লবোরো গুঁজে দিল। নৃত্যরতা বেবি

খানকির সাতটি রন্ধ্রপথ দিয়ে তখন পেট্রলের নীলচে গ্যাস হিস হিস করে বেরোচ্ছিল। তায় আবার মো মো। সোলজারটি লাইটার বের করে বেবি খানকির মুখের সিগারেটটি জ্বেলে দিল।

পরে ভস্মীভূত ওই বারে ৩৭ জল সোলজার, ৩ জন ওয়েটার এবং পুড়ে ছোটো হয়ে যাওয়া একটি পিগমি ফিমেল বডি— মোট ৪১টি তন্দুর মড়া ঘেঁটেঘুঁটে ইউ.এস. আর্মির মিলিটারি ফরেন্সিক ব্যুরো রিপোর্টে বলেছিল যে বিস্ফোরণটি চার-পাঁচটা মলোটভ ককটেলের মতোই।

গোটা বাড়িটাই দাউ দাউ করে জ্বলছিল। মুখে মোমো-র গন্ধ নিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে ফুটপাথে অনেকের মধ্যে দাঁড়িয়েছিল পারিজাত। কান্নায় ঝাপসা চোখে দেখছিল দাউ দাউ করছে মারাত্মক লেলিহান আগুন।

ঘণ্টা বাজিয়ে ফায়ারব্রিগেডের গাড়ি এসেছিল। সেই গাড়ি থেকে নেমে ফায়ারম্যান আগুনের আলোয় পারিজাতকে দেখে এগিয়ে যায়...পারিজাত ডুকরে উঠেছিল,

—বেবি কে, চলে গেল।

ফায়ারম্যান সমবেদনা জানিয়ে পারিজাতের কাঁধে দুবার প্যাট করেছিল, তারপর আগুনের দিকে তাকিয়ে আপন মনে বলে উঠেছিল,

—অ্যামেরিকান পেট্রোম্যাক্স!

# ফায়ার-ফাইট

পারিজাত ও বেবি কে-র গল্প তো এটা বটেই, কিন্তু গল্পটা সাইজ করা হয়েছে সেই হাড়হাভাতে উঠকো বছরটাতে যখন প্রায় প্রত্যেকটা দিল কলকাতায় হয় আট-দশটা বাড়ি নয় শপিং মল বা বস্তি বা মহল্লা অথবা নার্সিং হোম কিংবা হোটেলে, কোনও কিছু একটা হতে হবেই, আগুন লাগছিল এবং যখন দেখা গেল সেগুলো নেভানো যাবে না তখন আগুনগুলোকে তাদের নিজের নিজের মতো করে জ্বলে যেতে দেওয়াই ঠিক বলে মনে করা হল। আগুনগুলো নিজের খেয়ালখুশিমতো লাগছিল বা কেউ ছক করে লাগাচ্ছিল— কোনওটাই বোঝা যায়নি এবং ছুটকোছাটকা যে কানাঘুষোগুলো ভেবেছিল বাজার গরম করবে সেগুলোও সুবিধে করতে পারেনি একরত্তি। বরং কিছুদিন পরেই এই দেদারে আগুন লাগার ব্যাপারটা এমনই গা-সওয়া ও স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল যে সরকার বা বিরোধী পক্ষ, যারা আসল, প্লাস কুচোকাচা হাবিজাবি দল যারা ঘরোয়া আড্ডার নাম দিয়েছে বিকল্প পরিসর, তারাও আর এই আগুন-ফাগুন নিয়ে মাথা ঘামানো ছেড়ে দিয়েছিল। ফায়ার ব্রিগেডও যেত না। এরকমই নাকি হয়। অন্য জায়গাতেও হয়েছে। অন্য দেশেও। নানা শহরেও। অবশ্য সব জায়গায়

আগুন নয়। কোথাও স্রেফ খুন। কোথাও বোমা ফাটা। কোথাও কবর থেমে মড়া চুরি। কোথাও বাচ্চাদের ধরে ওয়াশিং মেশিন বা ডিপ ফ্রিজে ভরে দেওয়া। বা পাবলিকের ওপর দিয়ে হাই স্পিডে গাড়ি চালানো। সেরকমই ছিল, সেই বছরটাতে কলকাতার আগুন। ঘড়িতে বা মোবাইলে যেভাবে অ্যালার্ম সেট করে সেভাবেই ওই বছরটাতে পারিজাত ও বেবি কে-র গল্পটাকে আমরা সেট করেছি।

আকাশে আগুনের ভলকা। একটু দূরেই মাল্টিস্টোরিড অ্যাপার্টমেন্টটা আগুনের আলোয় ঝলমল করছিল। গরচায় যখের যে বাংলা মালের ঠেক রয়েছে, যার ওল্ড স্টাইল খিলান দরজার ওপরে বিরাট, গোল একটা জাহাজি আলো জ্বলে তার পাশেই, গলিটার মুখে একটা সাবানের কারখানা ছিল, উঠে গেছে। তারই পুরোনো ছেঁড়াখোঁড়া, হলদেটে পোস্টার মারা জংধরা গেটের সামনে লজঝড়ে মোপেডটাকে দাঁড় করাল পারিজাত। মোটা মানুষ। ঘামছে। 'স্টাড' লেখা হেলমেটের চারদিক দিয়ে ঘাম নামছে। নোংরা, নীলচে শার্টে জমে রয়েছে ঘাম শুকোনো নুনের সাদা। হেলমেটটা বগলদাবা করে হাসফাঁস করতে করতে পারিজাত ঠেকের ভেতরে ঢুকে দেখল বিশাল চেহারার ফায়ারম্যান

তক্তপোশের ওপরে একটা বড় খোলা বোতল, প্লাস্টিকের মগে জল, শালপাতায় কল-বেরনো ছোলা-লঙ্কা নিয়ে বসে আছে। থম-মারা ফেস। সামনের দিকে তাকিয়ে। ঠেকে ভিড় কম। উবু হয়ে বসে কিছু পাবলিক। দু-একটা লোক বোতল বা পাঁইট নিয়ে আসছে যাচ্ছে। বোধহয় ভেতরে মাল নামানো হচ্ছিল। বোতলের আওয়াজ। হেলমেটটা রেখে পারিজাত বলল,

—কতক্ষণ?

ফায়ারম্যান উত্তর দিল না। একেই দশাসই। তায় গম্ভীর। কী যে ভাবছে জানাজানির কোনও কেস নেই।

—তা হলে একটা পাঁইট নিয়ে আসি? হেলমেটটা রইল।

—কেন? পাঁইট আনতে হবে কেন? পুরো বোতল নিয়েছি। স্টার্ট করিনি। একটা গেলাস আনলেই হবে।

পারিজাত পয়সা দিয়ে গেলাস আনার পর ফায়ারম্যান খোলা ছিপিটা বোতলের মুখ থেকে সরিয়ে আধগেলাস আধগেলাস ঢালল। নিজের আধগেলাসটা নিট মেরে দিল। অ্যা...ঃ শব্দ করে জামার হাতায় মুখটা মুছল। আলতো একটা হাসি ফুটেছে।

—সরে বোসো। সিগারেট জ্বালব।

পারিজাত একটু সরে গেল। সিগারেটটা জেলে, জ্বলন্ত কাঠিটা হাতে, আলতো সেই মার্ডারার-মার্কা হাসিটা মুখে নিয়ে ফায়ারম্যান বলল,

—তোমার ভয়টা একটু বেশি। কি ভাবলে? ওই বাড়িগুলোর মতো ঝপ করে ধরে যাবে? দেরি আছে।

—ওর সঙ্গে থাকলে তোমারও ভয় ধরে যেত।

—কি দায় পড়েছে যে ঘরভরা বউ থাকতে ওইসব, পেট্রল ফেট্রল খায়, ওর সঙ্গে থাকতে যাওয়ার! কোনও লাভ আছে? ছাড়ো। একটা টান দেবে? কিছু হবে না।

—টানব?

—বলছি তো কিছু হবে না। ডাক্তার তো বলেছে যে পেট্রল এখন স্রেফ তোমার ব্লাডে ঢুকেছে। সারা গায়ে ছড়াবে। দৌড়োবে। তারপর, টেরটাও পাবে না। মগজে রসে যাবে। তখন আর সিগারেট চলবে না। ভেতরে ধোঁয়া টানলে আগুন হয়ে ঢুকে যাবে।

—ডাক্তার বলেছে দেরি আছে।

—তা আছে।

সিগারেটটা ফেরত দেয় পারিজাত। ছোট করে একটা চুমুক মারে। ঠোঁট কাঁপছে। নাক

ফুলছে। চোখে জল আসব-আসব। ফায়ারম্যানের নজর এড়ায় না।

—নো কান্না! নো কান্না! মরদ যখন হয়েছ, লড়ে যাও। বুক ফুলিয়ে বল— যো হোগা সো হোগা। ও দোনামোনা করলেই মুড়ির মতো মিইয়ে যাবে। অত ভাবার কী আছে? আর কত ভাববে? কত কিছু নিয়ে ভাববে? ঘপাঘপ এই যে আগুন লাগছে, কালীপটকার মতো বাড়ি পুড়ছে—কিছু করতে পারবে ভেবে?

—তা হলে কী করব?

—কী আবার করবে? ফেরার কোনও রাস্তা রেখেছ যে করবে? ঘর-সংসার ছাড়লে, বউ-বাচ্চাকে ভোগে দিলে—ফর হোয়াট? একটা নাটকা মাল, আসল নামটা আর বললাম না, তা হবি তো হ, লে স্রেফ পেট্রল খায়। লোকে ভাত খায়, আলু খায়, আর এ খায় পেট্রল! গোড়ার দিকে পই পই করে কত বললুম, বল, বলিনি?

পারিজাত ঘঁকঘঁক করে শব্দ করে শুয়োরের স্টাইলে মাথা নাড়ে। জানায় হ্যাঁ। হঠাৎ দূরে ভয়ঙ্কর আওয়াজ করে কি একটা ফাটল। ফায়ারম্যানের হাতের গেলাস থেকে আর একটু হলেই মালটা ছল্‌কে যেত। পারিজাত বলল,

—আগুন-ফাগুনের মধ্যে আবার বোম

ঝাড়ছে নাকি?

—ধুস্। যে বাড়িটা জ্বলছিল ওর মধ্যে গ্যাসের সিলিন্ডার ফাটল। টাইম লাগে তাত্তে। খাট, আলমারি, টিভি, ফ্রিজ—সব জ্বলে যাওয়ার পর ফাটে। লাস্টে। একে কী বলে জানো?

—কি?

—গোল্ডেন গোল। নকআউট ব্লো-ও বলতে পার। কখনও বক্সিং লড়েছ?

—পাগল? নাক-ফাক নাকি ভেঙে দেয়?

—ফুটবল?

—খেলিনি। তবে দেখেছি।

—কেন, খেলনি কেন?

—ছোটবেলা মানত করে পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছিল। খেলতে গেলেই লাগত। তাই দেখতুম।

—আজব মাল তো! সেই তুমি কিনা শেষে... যাকগে... ঝপ করে এক প্লেট হেড-ঘুগনি নিয়ে এসো তো। ওই যে ন্যাড়া মতো মালটা কুপি জ্বেলে বসে আছে। হেভি বানায়।

—হেড-ঘুগনি বলব?

—আবার কি? মুরগির মাথা দিয়ে বানায়। নিয়ে এসো। পয়সা আছে?

—হয়ে যাবে পেট্রল কিনতে কিনতেই তো ফতুর।

—নিয়ে এসো। তরিবৎ করে মালটা খাওয়া যাক। এ বালের ছোলার চাট—চলে না।

পারিজাত হেড-ঘুগনি নিয়ে ফিরে আসার একটু দেরি আছে দেখে হিউজ আড়ার ফায়ারম্যান চোখ বন্ধ করে, দুলে দুলে, একটা ওল্ড হিন্দি সঙ ভাঁজছিল মনে মনে। যব দিল হি টুট গয়া... হাম জিকে কেয়া করেঙ্গে... যব দিল হি টুট গয়া... বেশ রগড় জমেছে বাজারে... চারদিকে আগুন, গলিতে, রাস্তায়, সব জায়গায় হু হু আগুন, আলটপকা আগুন, ধোঁয়া, ঢেউ তুলে তুলে ছুটে আসা আগুন, কাঠ-ফাট জ্বালিয়ে, কংক্রিট ফাটিয়ে, লোহার শিকগুলোকে বাঁকিয়ে, দুমড়ে, গলিয়ে, দলা দলা আগুন, অথচ এত যে ফাউ আগুন হিয়ার অ্যান্ড নাউ আগুন, একটা আগুন লাগলে অনেকগুলো ফ্রি আগুন, কত আগুন তুমি গুনবে, মুঠো মুঠো দেদার আগুন বাট কোথাও কোনও দমকলের ঘণ্টা নেই, এমন নয় যে লোক নেই, গাড়ি নেই, জলের পাইপ নেই, জল নেই, মাস গেলে মাইনে হয় না, কিন্তু... চটকাটা ভেঙে যেতে দেখল পারিজাত হেড-ঘুমনি নিয়ে এসে গেছে...

—হেভি টেস্ট তো!

—সেই তো বললাম। ন্যাড়া হলে কি হবে মাথায় বুদ্ধি আছে।

—হেড-ঘুগনি বানিয়েছে বলে?

—তো আবার কি? মেজরিটি পাবলিক আজকাল হেডগুলো নেয় না। কেউ কেউ আছে আবার—ওনলি ঠ্যাঙ। দু-চার টাকা দিয়ে গাদাখানেক হেড নিয়ে এসো। এনে শালা ছ্যাঁকছোঁক, লঙ্কা—ব্যস। পারি না!

এই সময় পারিজাতের মোবাইল বাজল।

—না না দেরি হবে না। আসছি। হ্যাঁ রে বাবা আনব। গাড়িতে ছোট জেরিক্যানটা আছে। ধুস। ও কাটা তেল-ফাটা তেল নয়। পাম্প থেকে নেব।

কার ফোন ফায়ারম্যানের বুঝতে অসুবিধা হয় না। বেবি খানকির ফোন। বেবি খানকি বা বেবি কে-র খিদে পেয়ে গেছে। বেবি কে পেট্রল ছাড়া আর কিছু খায় না। পেট্রল কিনতে কিনতে পারিজাত ফোঁপরা হয়ে যাচ্ছে।

—ব্ল্যাক সোয়ান কাকে বলে জান?

—কোনও মালের নাম? যেমন ব্ল্যাক ডগ?

—না।

—তা হলে কী?

—বলছি। হেভি ইন্টেলেকচুয়াল ব্যাপার। আমাদের অফিসে একটা নতুন ছেলে ঢুকেছে। খুব বই-ফই পড়ে। ও বলল কেসটা— ব্ল্যাক সোয়ান। আগডুম-বাগডুম নয়, হাই থট।

—ও আমার মাথায় ঢুকবে না।

—ঢুকবে। পেট্রল চাঁদিতে যেতে আর একটু দেরি আছে। তখন আর ঢুকবে না।

—বল...

—ব্ল্যাক সোয়ান হল তাজ্জব একটা কেস। একদম মেগা একটা ঝামেলা। যেটার কথা কেউ কখনও ভাবেনি। আচমকা এসে পড়বে। মানুষ ভাবছে সব কিছু বুঝে গেছে। ভূত ভবিষ্যি সব তার পকেটে। বেমক্কা একটা ঝামেলা এসে পড়বে যে পুরো চোদু বনে যাবে। আচমকা ঘাপ! আগে কোনও মিঞা বুঝতে পারবে না। দুনিয়া জানবে এইরকম। সবাই জানত রাজহাঁস সাদাই হয়। হঠাৎ জানল অস্ট্রেলিয়াতে একটা কেলে মালও রয়েছে। সেই থেকে নামটা দিয়েছে।

—এই যে হুটহাট আগুনগুলো লাগছে, এটাও কি ব্ল্যাক সোয়ান?

—জানি না। হলেই হল। রাজহাঁস দেখেছ?

—চিড়িয়াখানায়। ঝিলটায় ঘুরে বেড়ায়। লোকেরা পাঁউরুটি খেতে দেয়।

—হেভি হারামি টাইপের। দেখলে মনে হবে সতী, ঢেমনি—ভালো মনে করে কাছে গেলে। বাঁড়া প্যাঁক পাঁক করে কামড়াতে এল। নাও, মাল খাও। হাজারটা ঝুটঝামেলা। মাল

খাও। মাল খাও। ক্যাচাল ফ্যাচাল আর ভালো লাগে না।

ফায়ারম্যান আর একটা সিগারেট জ্বালায়। ওর একটা পেয়ারের দামড়া হুলো আছে যেটাকে রোজ রাতে বাড়ি ফিরে ফায়ারম্যান চটকে চটকে আদর করে। ফায়ারম্যানও বিরাট। ওর হুলোটাও ইয়া। ওর সবকিছুই বড় বড়। বউটা যদিও ছোটখাটো।

যে মাল্টিস্টোরিড বাড়িটা জ্বলছিল তার টপ ফ্লোরের বারান্দাটা নীচে পড়ল। বাতাসে ছাই উড়ছে। ধোঁয়া। কাঠ-ফাট কিছু থেকে থাকবে। হাওয়া লেগে অনেক ফুলকি ঠিকরে বেরোয়। এতে খুব একটা কিছু এসে যায় না। বাড়িটার উল্টোদিকের ফুটপাথে লোক যেমন চলছিল, চলতে থাকে। কেউ কেউ হাঁটতে হাঁটতে মোবাইলে কথা বলছে। কেউ আপন মনে বিড়বিড় করছে এবং হেড সেটে এফ.এম. রেডিয়ো শুনছে। গাড়িগুলো আগুন-ফাগুন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। একটু উল্টোদিক চেপে চালাচ্ছে, এই যা। আকাশে একটা হলদেটে আগুনরঙা চাঁদ। কাজ নেই কম্মো নেই, বেকার জ্বলে যাচ্ছে।

এই সময় ঠেকের গেটের জাহাজি আলোটা নিভে গেল। এটা হল অ্যালার্ম নাম্বার ওয়ান।

ঠেক বন্ধ হবে। কাউন্টার ক্লোজ। এরপরেও আধঘণ্টাটাকের মধ্যে ঘপাঘপ খালি করো। করে ফোটো। এটা কেন হয় কেউ জানে না। ওই ফার্স্ট অ্যালার্মের সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় বোতল ফেরত দিয়ে পয়সা নেওয়া বা গাঁইগুঁই করে লাস্ট একটা পাঁইট বাগানো বা নিছক বাওয়ালের জন্যে বাওয়াল, আড়ায় আড়ায় বডি কলট্যাক্ট—কিছু না কিছু একটা বালের ফ্যাকড়া ধরে কিচায়েন লেগেই যায়। এবারেও গেল। এবং যেটা হয়েই থাকে, গুছিয়ে ভালো করে একটা টিক্ দেওয়ায় দম যাদের নেই তারাই—'দানা ভরে দেব', 'ভুঁকে দেব', 'রামপুরিয়া', 'বরাব্বর', 'খাল্লাস'—এইসব ফালতু বাকতাল্লা যার অনেকটাই সিনেমার থেকে পাওয়া, সেগুলো প্লাস খিস্তি দিয়ে কাকে চমকায় কেউ জানে না। কালই যখন দেখা হবে তখন কেউ মনেও করবে না কে কাকে গত রাতে ভোগে দিচ্ছিল। তবে এর মধ্যেই টুকরো টাকরা ভাঙা দাঁত, পকেট থেকে পড়ে যাওয়া অ্যালজোলাম ট্যাবলেট, উঠে যাওয়ার কারখানার শ্রমিকের আইডেনটিটি কার্ড, হাসপাতালের চোতা, ভাঙা সেলফোনের সিমকার্ড—এসবও যে পাওয়া যায় না এমন নয়। একবার এই সবকিছুর সঙ্গে, একটা ভাঁজকরা, তারিখ না বসানো

সুইসাইড নোটও ছিল। সেটা কেউ খোলেওনি, পড়েওনি। মেথরের ঝাঁটায় ওলোটপালট খেতে খেতে কাগজটা ময়লার গাড়িতে চলে যায়। সুইসাইডটা করা হয়েছিল কিনা, না ওটা লিখে ফেলা ফাঁকা আওয়াজ সেটা নিয়ে ডায়লগ অবশ্য চলতে পারে। ভাট টাইমে এইসব খজড়ামির ভালো বাজার রয়েছে। ঠেক থেকে ফায়ারম্যান ও পারিজাত বেরিয়ে আসে।

—সাবধান! পা জড়াচ্ছে।

—নেশাটা আজ এত ধুম হয়ে গেল কেন, বল তো?

—ও হয়। এক একদিন দেখবে টেনেই যাচ্ছ, টেনেই যাচ্ছ বাট নো নেশা, আসছে একটু ঝিম ফের কেটে যাচ্ছে। আবার এক একদিন ফাস্ট চুমুক থেকেই হাতড়াতে হবে। দুমদাম আগুন-ফাগুন ফাটছে, দেখে চালিয়ো। বেশি ডাঁয়াবাঁয়া করবে না। পেছনের গাড়ি হয়তো প্যানিক খেয়ে ঝেড়ে দিল। মনে রাখবে, সবাই তেতে আছে।

ঝ্যাড়র ঝ্যাড়র করতে করতে পারিজাতের মোপেড চলে যাওয়ার পরেও ফায়ারম্যান তার বিশাল চেহারাটা নিয়ে থপকি মেরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খেল। তারপর ঘপ ঘপ করে পা চালাল। একটা কথা এই ফাঁকে বলে

দেওয়া দরকার। কোনও কোনও সময়, সাইড থেকে দেখলে বা দেওয়ালে জাম্বো ছায়াটা পড়লে ফায়ারম্যানকে সোভিয়েত আমলে তৈরি স্ট্যাচুগুলোর মতো দেখায়। আকাট আকাট, হিরো হিরো।

ইলেকট্রিক চুল্লির যুগ শুরু হওয়ার আগে ব্যস্ত শ্মশানগুলোতে যেভাবে এখানে ওখানে চিতাগুলো জ্বলত সেইরকমই কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় একটা না একটা বাড়ি ঠায় জ্বলছিল। তার মধ্যেই রাস্তা। দোকানপাট। কুকুর। একটু ঘুপচি দেখলেই দাঁড়িয়ে থাকে কমবয়সী মেয়েরা যাদের হাতে ধরা মোবাইলে আলো জ্বলছে বা নীল ঝিলিক মারছে। এরই মধ্যে কোথাও চাইনিজ টুনি বাল্বের ঝাড়, দুই বাড়ির মধ্যে দড়ি থেকে ঝোলানো ব্রেজিল বা আর্জেন্টিনার নম্বর লেখা জার্সি, কোনও গলির মোড়ে একটি ক্লান্ত, ঘেমে যাওয়া ছেলের নাচে ক্যাওড়াদের হাতাতলি। মুন ওয়াক। ক্রচ ক্লাচ। টুলের ওপরে রাখা টু-ইন-ওয়ান। ট্র্যাফিক লাইটে দাঁড়িয়ে যায় পারিজাত। আড়চোখে দেখে নেয় অন্ধকার আকাশে খুব নিচু দিয়ে একটা জ্বলন্ত প্লেন গেল। বোধহয় আছড়ে পড়ার জন্যে একটা ফাঁকা জায়গা খুঁজছে। ব্ল্যাক সোয়ান! ব্ল্যাক সোয়ান!

সামনে একটা বড় মোড়। কিন্তু বীভৎস জ্যাম। পারিজাত বাঁদিকের একটা গলিতে মোপেড ঢুকিয়ে দিল। এই শর্টকাটটা পারিজাতের চেনা। একটু এগোবার পরে বাঁদিকে একটা ন্যাড়ামার্কা পার্ক পড়ে যেখানে কয়েকবার বেবি কে-কে নিয়ে পারিজাত এসেছে। পারিজাত বসে বসে চুড়মুড় বা ভেলপুড়ি খেয়েছে, বেবি কে ব্যাগ থেকে ওয়াটারবটল বের করে খেয়েছে পেট্রল। এই পার্কে আসাগুলো কিন্তু খুব হালের ঘটনা নয়। পারিজাতের ঘরছাড়ার পরের কয়েক মাসের ব্যাপার। সকলেই এটা জানে যে এইসব ঘটনা গোড়ার দিকে ঘটে যখন ধুনকি গরম থাকে। পারিজাতের সঙ্গে একটা সাইকেলওয়ালার আর একটু হলেই লেগে যাচ্ছিল। লেগে গেলেও সাইকেলওয়ালারা-ই দোষ। আলো-ফালো নেই, আচমকা গলি থেকে ধাঁ মেরে বেরোল, টাল মেরে সামলে নেয় পারিজাত। পা বাড়িয়ে ব্যালেন্স করে। অল্প একটু রগড়াও লাগল। ঝগড়া একটা হতেই পারত কিন্তু হয় না।

—সরি দাদা। গাড়ির আওয়াজটা খেয়াল করিনি।

—মাল ঝাল খেয়ে আছি। লাগলে পাবলিক আমাকেই ক্যালাত।

—কে পাবলিক? আপনি আমিই তো পাবলিক এখানে।

—তো ঠিক আছে।

পারিজাত ফের মোপেড হাঁকায়। ব্ল্যাক সোয়ান! ব্ল্যাক সোয়ান! ফের ডানদিক ধরে বড় রাস্তায় এসে পড়ে। যেভাবে গাড়িগুলো চলছে তাতে বোঝা যায় যে জ্যামটা ছেড়েছে। মড়া নিয়ে যাওয়ার কাচের গাড়ির পেছনে পড়ে যায় পারিজাত। মড়ার গাড়ি দাঁড়ায়। কাচের ভেতর দিয়ে দুটো পা দেখা যাচ্ছে। একটু পরেই পুড়ে যাবে। আজ কী বার? মড়া দেখা ভালো না খারাপ? অজান্তেই কপালে হাত ঠেকায় পারিজাত। গাড়ির বাইরে বাঁধা গোছা করা ধূপের গন্ধ পোড়া ডিজেলের গন্ধের সঙ্গে মিশেছে। তার সঙ্গে তালগোল পাকাচ্ছে বিড়ি সিগারেটের ধোঁয়া। হ্যাঁচকা মেরে মেরে মড়ার গাড়িটা চলতে শুরু করে। পারিজাতের মোপেডও। মোপেড মড়ার গাড়িকে ফাঁক পেয়ে ওভারটেক করে। ব্ল্যাক সোয়ান! ব্ল্যাক সোয়ান! গাড়িগুলো ফের দাঁড়িয়ে গেল। দাউ দাউ করে জামাকাপড় জ্বলছে, একটা লোক, দৌড়ে রাস্তা পার হল। বোধহয় জলফল দেখলে গড়াগড়ি দেওয়ার ধান্দা। গাড়িগুলো ফের চলতে থাকে। এবং তার ফাঁকফোঁকরে

গোঁত্তা মেরে এগোয় মোপেড। চলন্ত মোপেডে মাল খেয়ে সাঁটিয়ে বসে থাকতে কার না ভালো লাগে? বিশেষ করে যখন মখমল মার্কা বাতাস এসে ঘেমো মুণ্ডু আর বুকে মুখ ঘষে! কিন্তু এই হাওয়াটা গরম যার মধ্যে গুঁড়ো গুঁড়ো ছাই লুকিয়ে আছে। হলকা। তাতাল। উনুন থেকে ছিটকোনো স্পার্ক। ব্ল্যাক সোয়ান! ব্ল্যাক সোয়ান!

পেট্রল পাম্প থেকে পাঁচ লিটার তেল কিনল পারিজাত। বুড়োটা তাকে চেনে। বেবি কে-কেও। জেরিক্যানটাও তার চেনা। পারিজাত যখন বেবি খানকিকে চিনত না তখনও বুড়োটা চিনত। কতবার বেবি কে উবু হয়ে বা হাঁটু গেড়ে বসেছে আর বুড়োটা নলটা বেবি কের মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে ট্রিগার টিপে চোখ রেখেছে সরতে থাকা নম্বরগুলোর ওপর।

—কেমন আছে এখন?

—ওই একরকম।

—ফালতু নিজের লাইফটা বরবাদ করলেন। খাত্‌রা কেউ ঘাড়ে পড়ে নেয়? একদিন দেখবেন বোমের মতো ফাটবে।

—কবে?

—সে কি করে জানব? টাইম হলেই ফাটবে। ধারেবাড়ে থাকলে আপনিও মোরগা রোস্ট।

বাড়ির সামনে এসে দূর থেকে চমকে গেল পারিজাত। একতলার ঘরে রাস্তার দিকে দুটো জানলাই খোলা। ভেতরে আলো জ্বলছে। আলোর মধ্যে আরও আলো দপদপ করছে। মানে টিভিটাও চলছে। পাড়ার লোকেদের উঁকিঝুঁকির জন্যে ঘরটা বন্ধই থাকত। পেট্রলের গ্যাসে ম-ম করত ঘরটা। টিকটিকি, আরশোলা, পিঁপড়ে, মশা—সব পালাত। না পালাতে পারলে মরে যেত। ভয়ঙ্কর গন্ধ ছিল কলঘরে যার একটা দিকে পায়খানা। পেট্রলের পেচ্ছাপের গন্ধ। জলের ওপরে আলো পড়লে দেখা যেত পেট্রলের নীল সোনালি রং।

পারিজাত বুঝতে পেরেছিল ঘরটা খাঁ খাঁ করবে। কেউ থাকবে না। বেবি কে থাকবে না। কোনও এক ডাইনি পরীদের ম্যাজিকমাখানো সন্ধেবেলায়, আবছা আলোয়, ভুলভাল কোনও পেট্রলপাম্পে যে নাটকা পেট্রলখেকো খানকিটানে পারিজাত পেয়েছিল, তাকে চারদিকে যখন আগুনে আগুনে ফায়ার-ফাইট চলছে তখন হারিয়ে ফেলতেই হবে। ফায়ার-ফাইট কথাটার মানেটা যদিও অন্য। কিন্তু মানেগুলোকে কি এক জায়গাতেই দাঁড়িয়ে থাকতে হবে? লে! মোদ্দা কথাটা হল বেবি কে যদি এখন বেপাত্তা বেখবর হয়ে না যায় তা হলে গোটা গল্পটাই বাতিল

হয়ে যাবে।

ঘরে ঢুকে পারিজাত দেখল সাদা দেওয়ালে সস্তার লিপস্টিক দিয়ে বেবি খানকি লিখে দিয়ে গেছে—

টা টা। রোজ খাবারের কষ্ট দিয়ে বাঁধা খানকি পোষা যায় না। আমাকে নিয়ে যাচ্ছে যে, সে একটা পেট্রল পাম্পের মালিক। বম্বে রোডের ওপরে। ওখানে একটা ধাবায় ঘর নিয়েছে আমার জন্যে। যত ইচ্ছে পেট্রল খাব। ওই ঘরটা এই ঘরটার চেয়ে অনেক ভালো। ওখানেই উড়ব। কান্নাকাটি না করে দু চাকা চালিয়ে বউয়ের কাছে ফিরে যাও। এরপর থেকে মোপেডের পেট্রলটুকুই কিনতে হবে। রাত গয়ি তো বাত গয়ি। কিস...!

ঘরে টিভি চলছে। ভলিউম জিরো। ক্রিকেট ম্যাচ হচ্ছে।

জেরিক্যান মেঝেতে রেখে হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে থেবড়ে বসে পড়ে পারিজাত। চোখের জল মুখের লালার সঙ্গে মিশে সুতো হয়ে ঝুলতে থাকে।

—বেবি কে! বেবি কে! বেবি কে...চলে গেল!

দেওয়ালের লেখাগুলো ধেবড়ে ছবি ছবি হয়ে ঢেউ ধরে।

ফায়ারম্যান বাড়িতে ফিরে চানফান সেরে বগলে ঘাড়ে পাউডার মেখে টেবিল ফ্যান চালিয়ে মৌজে বসেছিল। হঠাৎ শুনল তার পোষা হুলোটা টগর গাছটার পেছনে, পাঁচিলের ওপরে, রাগে গ্যাঁও গ্যাঁও করছে। গিয়ে দেখেছিল, রোঁয়াফোলানো হুলোটার উল্টোদিকে বসে আছে একটা বিরাট কালো রাজহাঁস।

# বেবি কে অ্যান্ড স্পাইডারম্যান

পারিজাত

পারিজাত যে ওষুধ কোম্পানির রিপ্রেজেনটেটিভ সেই কোম্পানির স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাবের ফাংশন ছিল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে। ছিল নাচ-গান, খাবারের বাক্স, পেপসি ও শেষে একটি নাটক— 'রক্তখেকোর তাণ্ডব'। হেভি ভয়ের নাটক। সিরিয়াল কিলার এক ডাক্তারকে নিয়ে। নাটকটার লাস্ট সিনে ডাক্তার ধরা পড়ে। এবং সেই সিনটায় স্টেজে একটা মাকড়সার জালের করাল ছায়া এসে খেলাটা জমিয়ে দিল। একদিকে সার্জেন্ট, কনস্টেবল, রিভলভার, রাইফেল। অন্যদিকে সিরিয়াল-কিলার ডাক্তার দুহাত তুলে ফ্রিজ। এবং মাকড়সার জালের ছায়া। এভাবেই রক্তখেকোদের তাণ্ডব শেষ হয় বলে শোনা যায়। যাই হোক, নাটকটা শেষ হওয়ার পরে পারিজাত স্টেজে উঠে গিয়ে দেখেছিল নাইলনের দড়ি দিয়ে বানানো বিশাল একটি জাল। এবং সেই জালের কাছে গিয়ে দাঁড়াবার জন্যে পারিজাতকে স্পাইডারম্যান বলে গল্পের গোড়াতেই একটা আইডিয়া ধরিয়ে দেয়া গেল। এবার আরও একটু বলে ফেলা দরকার। পারিজাতের ঘরসংসার, টিভি, সেকেন্ডহ্যান্ড ফ্রিজ—সবই ছিল। কিন্তু নিয়তির এমনই খেলা

যে বেঁটে একটা খানকির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে সে সবকিছুই ছেড়েছে এবং ওই নাটকা খানকিটার নাম হলো বেবি খানকি বা বেবি কে. যে পেট্রল খায় এবং পেট্রল বাদে আর কিছুই খায় না। পুরো কেসটাই খুব গোলমেলে যেখানে একটা সিগারেটের টুকরো বা একটা ফুলকি শিবকালী বা চম্পাহাটির চার ডবল একটা ট্র্যাজেডি ঘটিয়ে দিতে পারে। বিচিত্র এই রিলেশনশিপটি যে টাইটানিকের মতোই অবধারিত এক গহন ও গভীর গাড্ডার দিকে চলেছে সেটা নিয়ে বার বার নানাবিধ সদুপদেশ দিয়ে এসেছে যে তার খপ্পরে এক্ষুনি পারিজাত পড়বে। আমরাও। সে হলো দশাসই এক ফায়ারম্যান যার আগুন নিয়েই যত কারবার। আমরি, স্টিফেন হাউস, প্লাস্টিক গোডাউন, রঙের কারখানা—সব জায়গাতেই এই ফায়ারম্যানকে আমরা টিভির পর্দায় দেখেছি। এবং আরও দেখব। পারিজাতের সঙ্গে তার দেখা হতো গরচার বাংলার ঠেকে। এখানে সন্ধের পর থেকেই মাইলস ডেভিস-এর 'Kind of Blue' শোনা যায় বলে মনে করা যেতেই পারে। ভুক্কাড় সার্কাসে, বস, এরকম ভুতুড়ে অনেক কিছু হয়। গেটের ওপরে একটা ঘোলাটে জাহাজি আলো জ্বলে। সেই আলোয় লম্বা লম্বা ছায়া পড়ে মাতালদের।

এদের মধ্যে কোন কোনও মাতাল নাকি ধোঁয়াটে আকাশে উড়ে যায় বলেও কানাকানি চলে। অবশ্য সবটাই মাইলস ডেভিস-এর ট্রামপেটের মতোই, নীল একটা আচ্ছন্নতার অবশ ধুনকি শেষ হিসেবে যার কোনও মানে দাঁড়ায় না।

এরই মধ্যে দেখা গেল ফাংশন-ফেরত পারিজাত কিছুটা দূরে, পাঁঠার মাথার ঘুগনিওলার গামলার সমীপেই তার বেতো ও লজ্‌ঝড়ে মোপেডটিকে দাঁড় করাল। তার ছায়াটি তখনও বেঁটে যদিও বেবি কে.-র চেয়ে বড়ো। একটু পরে অনেকগুণ বেড়ে যাবে। সবটাই ঘটবে ভুক্কাড় সার্কাসের নিয়মেই। কিছুটা দেখা যাবে, কিছুটা যাবে না। যেমন অনেক রাতে, কাছেই যে সাবান কারখানাটা ছিল, তার মরে যাওয়া মজুররা আসবে। সাবানের ফেনার ওপরে পড়ে চাঁদের আলো হড়কে যাবে। জাহাজি আলোটা সব দেখবে। একচোখে যক্ষের মতো। এবারেই আমাদের তক্কে-তক্কে কেটে যাওয়া ভালো। তা না হলে সেই লক-আউটের দিনগুলো ক্রাচ নিয়ে এসে হাজির হবে। পারিজাত, স্পাইডারম্যান পারিজাত, বেবি কে, ফায়ারম্যান—সব চৌপাট হয়ে যাবে এবং জাহাজি আলোর মধ্যে মাতালদের লম্বা ছায়া ডোরা ডোরা ঘুমন্ত বাঘের মতো

দেখাবে। ওসব দেখায় অনেক ঝক্কি আছে যা ঠিক গল্পের আয়ত্তে বা আয়নায় থাকে না।

....মৃতজনে দেহ প্রাণ...

পারিজাত গিয়ে দেখল এক কাণ্ড। ফায়ারম্যানের এক পাঁইট শেষ এবং সে মালের গেলাসে আঙুল ডুবিয়ে কি একটা করছে।

—কী করচ ওটা?

—রেসকিউ!

—মানে?

—একটা ফ্লাইং পোকা...মালে পড়ে গেচে...শালাকে বাঁচাচ্চি। ধরা যাচ্চে না। তুমি বরং একটা পাঁইট আনো।

—যাচ্চি!

ফারারম্যান পোকাটাকে তুলে টেবিলের গায় ছেড়ে দিল। পাখনা ভেজা। নড়চে না।

—বুজতে পারচি না ফুটে গেল কিনা। যদি না গিয়ে থাকো তা হলে হাওয়া খাও। হাওয়ায় মালটা উবে গেলে, ড্রাই হয়ে গেলে, ফের উড়তে পারবে। কী হলো? ঘাপটি কেস না ফিনিশ? ফ্যায়ারম্যান মালের শেষটুকু খেয়ে নিল। হিউজ বডি। কপালে ঘাম। একটা ফিল্টার চারমিনার ধরালো। তখনও পারিজাত পাঁইট নিয়ে না এলেও পারিজাতকেই বলতে থাকল,

—কতবার তো বলেচি। মাল খেয়ে বলেচি। না খেয়ে বলেচি—নাটকা মালটাকে ছাড়ো, ছেড়ে বৌ-বাল-বাচ্চার কাচে ব্যাক কারো—কানেই তুলচো না, এরপর এমন ব্যাদড়া আতান্তরে পড়ে যাবে যে কারও বাল, দুনিয়ার কোনও ফায়ারব্রিগেড রেসকিউ করতে পারবে না। শালা, বডিতে ব্লাড নেই, পুরোটা পেট্রল, বলতে গেলে একটা বোমা, তাই নিয়ে কেউ ঘাঁটাঘাঁটি করে। বুজবে। এমন বোজা বুজবে টাইম এলে, গেয়ে-ককিয়ে পাড়া মাতায় করলেও কোনও মামা এসে হাজিরা দেবে না। কেস্ জেনে কার দায় পড়েচে কাচে যাওয়ার? উরি : তারা!

পোকাটা একটু একটু নড়ছিল। কেতরে কেতরে একটু নড়ার চেষ্টা করছিল। পাখনাগুলো তখনও ভিজে।

—হড়বড় করো না। হড়বড় করো না। আরও শুকোও। মাথার ঝিমটাও কাটুক। আর এবারের মতো ফাঁড়াটা যদি গুরুর দয়ায় কেটে যায় লাইফে আর মালের মধ্যে ডাইভ মেরো না। মনে রাখবে সব জায়গায় ফায়ারম্যান থাকবে না যে রেসকিউ করবে...

—কাকে বলচ ডায়লগটা?

—এনেচ? পাঁইট?

—এনেচি।

—চলো। বলচি। ...বলছিলাম পোকাটাকে। রেসকিউ তো করলাম। এবার লড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা তোমার। সেটা তোমাকে নিজেকেই লড়তে হবে। কত তো ফায়ার থেকে বাঁচাই। কিন্তু বাঁচে না। এই দেকচ, রয়েচে, ক্যাঁ কোঁ করচে, এই দেখলে সান্নাটা। হয়ে গেল।

—বাঁচবে?

—কে?

—যাকে রেসকিউ করলে। পোকাটা।

—দেকচি। একটাই ভরসা।

—কী?

—মালটাও তো জালি। জল। নেশাটা দেকবে ধরতেই চয় না। এই! নড়চে! নড়চে।

পারিজাতও ঝুঁকে পড়ে। ত্যারচা আলোয় ফিনফিনে পাখনাগুলো নড়চে।

—চলবে! চলবে!

—কিক স্টার্ট মার! ইঞ্জিন চলবে। চালাও গুরু!

মির‍্যাকলটা শেষ অব্দি ঘটেই গেল। পোকাটা কেতরে কেতরে কিছুটা গেল। তারপর টেক-অফ করার জন্যে ঘুরে গেল। রানওয়েটা পেয়ে গেল। আস্তে আস্তে, তারপর জোরে, ফাইনালি পাখনা ঝেড়ে উড়ে গেল। পারিজাত হাততালি

দিয়ে উঠল। ফায়ারম্যান চেঁচিয়ে উঠল।

—রেসকিউ! রেসকিউ!

—পারলে তা হলে।

—কিন্তু তোমাকে পারব না। ওর ব্লাডে গ্যাঁজগ্যাঁজানি ধরেনি। কিন্তু তোমার ব্লাডে পেট্রল ঢুকে গেছে। ছাড়বেও না ওকে। বলে বলে মুক ব্যাতা করে ফেললুম।

—থামবে?

—অ্যাঁ!

—বলচি, থামবে?

—থামলুম। চওড়া করে ঢালো!

পারিজাত মাল ঢালে!

ফায়ারম্যান চোখ বন্ধ করে সামনে পেছনে একটু একটু দুলচে।

—তবে মানুষও পারে। আমি জানি। পারে।

—কী?

—উড়তে।

—উড়োজাহাজে? বড়লোকদের মতো?

—না, না, উড়োজাহাজে নয়। এমনি, এমনি।

—দেখেচ?

—না পড়েচি। সব বড় বড় সাধু। খেচর মুদ্রা না কি যেন বাল বসে। বলে ধ্যান করচে, আচমকা দেকলে উড়ে চলে গেল।

—কোথায়?

—চলে গেল কোনও তীর্থে। সে গয়া হতে পারে, কাশী হতে পারে। তোমাকে বলে যাবে?

—তাজ্জব কেস।

—পেট্রল খাওয়াটা কি কম তাজ্জবের? ভাত, ডাল, চাউ মেন, লুচি-পরোটা—সব থাকতে পেট্রল। পেট্রল! আচ্ছা, সত্যি আর কিছু খায় না? কোকাকোলা, কুড়মুড়ে, আলুর চপ, জলকচুরি?

—কিচ্ছু মুখে রোচে না। অনেক দিয়ে দেকেচি। ছোঁবেই না। ফোঁস ফোঁস করতে থাকে পারিজাত। এরপর ফুঁপোবে। ফায়ারম্যান জানে।

কারও মোবাইল ফোনে এফ.এম. রেডিয়োতে বাজছে। কিশোরকুমারের দুঃখের গান। গলির মধ্যে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে মাতাল খদ্দেররা মুতছে। তাদের পেচ্ছাপের প্যারাবোলায় পড়ে জাহাজি আলো চিকচিক করে।

—রাত্তির গড়াল। উটতে হবে।

—উটবে?

—হ্যাঁ।

—চলো, ওটা যাক।

—একটা জিনিস বুজতে পারো?

—কী?

—আমরা কিন্তু উটে যাচ্ছি।

—বুজলাম না।

—বুজলে না?

—না।

—পানামা সিগারেট ছিল। নরম প্যাকেট! খেয়েচ?

—তাতে কি?

—উঠে গেল। তারপর গিয়ে তোমার নাইট শো-তে সিনেমা। উটে গেল। বারোটার পরে লাস্ট বাস। উটে গেল।

—উটে গেল। উটে গেল!

দুজনে টলমল করতে করতে এগোয়।

—বেশ বলেচ কতাটা। উঠে যাচ্চি আমরা।

—বুজেচ? কী বললাম।

—পুরোটা বুজিনি কিন্তু অনেকটা তোমার ওই ভেজা পাখনা পোকাটার মতো। শুকিয়ে গেল। উড়ে গেল।

—উঠে যাওয়াটা অন্যরকম। উঠে গেলে কিছুই ফিরে আসে না।

—পোকাটা ফিরে আসবে?

—কে জানে?

তালগোল পাকানো এই দুটো মানুষের বাড়ি ফেরার সঙ্গে কোথায় যেন সেই মানুষগুলোর মিল আছে যারা আর বাড়ি ফিরবে না বলে যুদ্ধে চলে যায়। যারা উঠে যায় তাদের কেউ

মনে করে না। তারা নিজেরাও টের পায় না যে তারা উঠে যাচ্ছে। এটাই হলো দস্তুর।

তবে কি বুদ্ধই এইসব জুড়ে বসা অক্ষরগুলোকে বলছেন,

অন্য কোনও জায়গায়
কেন মনকে খোঁজো?
সমস্ত ঘটনার ভেতর দিয়ে
আমার আসল চেহারাটার
সঙ্গে দেখা হয়ে যায়
স্বাধীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে।
সেটা আমি হয়ে উঠতে পারি না
কারণ এর মধ্যেই আমি সেটা হয়ে গেছি।

তা হলে মানেটা কি দাঁড়াল? পারিজাত ও ফায়ারম্যান কি বাড়ি যাওয়ার নাম করে যুদ্ধে যাচ্ছে। রাতের এই টলমলে, আধা-অবশ, বিষাক্ত, ঝিম ধরা ধরা শহটাতে কি যুদ্ধ লেগে গেছে? আমরা কি হেলিকপ্টার গানশিপ, মেশিনগান, মর্টার ও এ.কে. ৪৭-এর আওয়াজ পাচ্ছি? তবে কি লেগেই গেল যুদ্ধ? আকাশের দিকে তাকিয়ে কেউ আন্দাজ করতে পারবে কখন বম্বারের প্রথম ঝাঁকটা আসবে? আকাশে ওগুলো কি ফ্লেয়ারের আলো? ওটা কি বোমার শব্দ। নাকি কোনও বাড়িতে গ্যাসের সিলিন্ডার ফাটল? ফায়ারম্যানদের এমার্জেন্সি ডিউটি পড়ে যাবে?

## ফায়ারম্যান...

ফায়ারম্যান বাড়িতে গিয়ে দেখল সকলে মিলে একজড়ো হয়ে 'কাটি পতং' দেখছে। এর ফলে তার মনটি প্রফুল্ল হলো এবং এই প্রফুল্লতায় লেখাটি চাপা পড়ে গেল যেখানে, এক অব্যক্ত আকাশে, কোটি নক্ষত্রের হুলিয়ায় সেই পুনর্জীবন ফিরে-পাওয়া ভাগ্যবান পতঙ্গটি অনন্ত সময় ধরে উড্ডয়নশীল। উপরোক্ত ভাগ্যবান পতঙ্গটির আনন্দময় জীবনের ওপরে একটি সিরিয়াল বা রিফাইন্ড ও মিডিয়োকার কোনও বাজার সফল মুভি নির্মিত হতেই পারে।

ফায়ারম্যান উঠোনের জলঘরে ধরা, ঠান্ডা বালতির জলে গা ধুলো। লুঙ্গি পরে পাউডার মেখে বারান্দায় রাখা প্লাস্টিকের চেয়ারে বসল। লাফ দিয়ে তার কোলে উঠে এল পোষা কালো সাদা হুলো।

## পারিজাত...

জানলা, দরজা সবই সবসময় বন্ধ থাকে। সেরকমই ছিল। কিন্তু পারিজাতের মনের কোনও কোণ থেকে সন্দেহের এক শুঁড় যেন দুলে উঠে বলে দিল যে বেবি কে. ঘরে নেই। নিজের চাবি দিয়ে ল্যাচ কি খুলে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল পারিজাত। ফ্যানটা এক পয়েন্টে ঘুরছিল।

গেলাসে একটু পেট্রল। সারা বাড়িতে ম ম করছে পেট্রলের গন্ধ। পুরো বাড়িটাই অতি-দাহ্য মধ্যপ্রাচ্য। তবে কি চলে গেছে বেবি কে.? হয়তো কোনও পেট্রলপাম্পের মাফিয়া মালিক বা দেদারে পেট্রল বাগাতে পারে এরকম কোনও ধাবার রাক্ষুসে ওনার মোক্ষম একটা টোপ দিয়েছিল যার বিন্দুবিসর্গও টের পায়নি পারিজাত? বা ফুঁসলে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত বা ইশারাগুলো সে বুঝতে পারেনি। বা বুঝতে পারলেও ভয়ে ট্যাঁ ফুঁ করেনি। করলে হয়তো খচ্চর লরি হয়তো তাকে মোপেডসমেত গুঁড়িয়ে দিত! বেবি কে! ডুকরে কান্না আসছিল পারিজাতের। জেরিক্যানটা দেখল। পাঁচ লিটার ছিল। এখনও লিটার তিনেক আছে। সারা বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে পেট্রলের মেঘ। বাথরুমে পেট্রল-পেচ্ছাপের গন্ধ। এই বাড়িতে একটাও আরশোলা, পিঁপড়ে বা টিকটিকি নেই।

পারিজাত ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। এমনিতেই মালের বশে কন্ট্রোলফন্ট্রোলগুলো আলগা হয়ে যায়। অবশ্য মাল না খেলেও হতে পারে। যেমন, যাদের সেরিব্রাল স্ট্রোক হয়। তারা দুঃখেও যেমন, রগড়-বটকেরাতেও তেমন। তবে কি বেবি কে. এখন গাড়ি চড়ে ঘুরছে? ইন্ডিকা বা মারুতিতে সে কি ড্রাইভারের পাশে

বসে না পেছনের সিটে, মালিকের সঙ্গে। ওরা কি পেট্রলের ঝুঁকিটা জানে? যদি লাইটার জ্বেলে সিগারেট ধরায়? কিংসাইজ? বেবি কে-র পেট্রল মেঘের নিশ্বাস যদি লাইটারের আগুনটাকে ছুঁয়ে দেয়। পারিজাত শুয়ে পড়লো খাটে। চিত হয়ে। হাত দিয়ে চোখ ঢাকা দিল। ওভারব্রিজের ওপর থেকে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠা গাড়িটা হয়তো ধারে ধাক্কা খেয়ে উলটে পড়ে গেল। বা হয়তো আগুনটা গিলে ফেলবে বেবি কে। তারপর ফাটবে! অত বড় মলোটভ ককটেল কেউ কখনও দেখেনি। একই সঙ্গে কান্না আর ঘুম পাচ্ছিল পারিজাতের। 'রক্তখেকোর তাণ্ডব', ফায়ারম্যান, জয়েন্ট মাকড়সার জাল, মালের মধ্যে পড়ে যাওয়া ভিজে পোকা, জাহাজি আলো—সব যেন নাগরদোলায় ঘুরপাক খাচ্ছে। সার্কাসে দেখা মৃত্যু-কূপে খেলা দেখাচ্ছে পারিজাতের ঝুল মোপেড। চলে গেল। বেবি কে. চলে গেল। আর কখনও আসবে না বলে চলে গেল। ঘুমের মধ্যে হাতড়াতে হাতড়াতে তলিয়ে যেতে থাকে পারিজাত। স্বপ্নের শব্দগুলোর ভলুম এত বেড়ে যায় যে দরজা খোলার আবছা শব্দটা শুনতে পায়নি পারিজাত। বেবি কে. ঢুকে দেখল পারিজাত গালে চোখের জল নিয়ে ঘুমোচ্ছে। গেলাসটা নিয়ে বাকি

পেট্রলটুকু ছোট ছোট চুমুক দিয়ে খেল।

বাথরুমে জল টানার চেনা শব্দটায় চটকা ভাঙল পারিজাতের। কে? তা হলে নির্ঘাত ফিরে এসেছে। বেবি কে.। ধড়বড় করে উঠে বসে। বেবি কে বেবি কে.। ওই তো! এক গাল করে হাসি দুজনেরই।

—ঘরে ঢুকে দেখি কেউ নেই। কোথায় গিয়েছিলে?

—ওই তো বীণাদের ঘরে।

—কে বীণা?

—ওই যে গো, মেয়েদের দর্জির দোকান দিয়েচে না। ওর ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। 'কাটি পতং' হচ্ছিল। অত ভালো বই। উঠে আসা যায়?

**স্পাইডার ও স্পাইডারম্যান...**

টেনশন ছেড়ে যাওয়া মনে শরীরটা আলগা দিতেই পারিজাতের পায়খানা পেয়ে গেল। এরকম অনেকেরই হয় বা মনে করলে দেখবে যে হয়েছে।

পায়খানায় কম হলেও পেট্রলের গন্ধ রয়েছে। ছোট জানলাটা খুলে দেয় পারিজাত। এদিক ওদিক শুঁকে সিগারেট জ্বালায়। পায়খানায় বসে। করতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গেই চোখ পড়ে

যায়। জাল। এবং তার মধ্যে মাঝারি মাপের একটা মাকড়সা। একটু একটু দুলছে।

এর মধ্যেই গল্পের গোড়ায় আর অন্তে আমরা স্পাইডারম্যান পারিজাতকে পেয়ে গেলাম। শুধু তাই নয়, ফায়ারমান, ভিজে পোকা ও বেবি কে অর্থৎ বেবি খানকিও নিজের ঢঙে হ্যালো বলে গেল। এর ফলে আমাদের যে নলেজ বাড়ল তার সঙ্গে আগের নলেজ জুড়ে কী আমরা করব সেটাই এখন দেখার অপেক্ষা।

# বেবি কে, পারিজাত, পঙ্গপাল
# ও
# মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ

এই গল্পটা চাখবার সময় পাঠক যেন নিরবছিন্ন একটা বোঁ...বোঁ...বোঁ...শব্দ, একটা একটানা অসংখ্য মিনি এরোপ্লেনের শব্দ কল্পনা করে নেয়, শুনতেই থাকে, শুনতেই থাকে, একেবারে গোড়ার থেকে শেষেরও পরে যেন শুনতেই থাকে বোঁ...বোঁ...বোঁ....ও....ও...এর কারণটাও বলে ফেলা যেতে পারে...গল্পটা ঘটার সময়ে বিশাল একটি পঙ্গপালের ঝাঁক কলকাতার ওপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিল। পঙ্গপাল ও ঐ জাতীয় বিতিকিচ্ছিরি পোকামাকড় নিয়ে যারা ঘাঁটাঘাঁটি করে তারা বলেছিল চীনের গোবি মরুভূমিতে পয়দা হয়ে রাক্ষুসে ঝাঁকটা উড়ে এসেছে। ওরা ওসব হিমালয় টিমালয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। লাখে লাখে উড়তে থাকে এবং রাস্তায় গাছপালা, পাতাফাতা যা পায় সাবড়ে হাওয়া করে দেয়। এবং তার নিট রেজাল্ট হলো ছাদে যারা শখ করে ফুলের বাগান বসিয়েছিল তাদের সাধের ফুল বাগিচা ওভারনাইট ধাঁ হয়ে গেল। একে শীতকাল, তায় পঙ্গপাল এসে মেঘলা ও ঝিরিঝিরি বৃষ্টি—এত বড় হ্যাপা সামলানো বাঙালির কম্মো নয়। অথচ বিলেতে এরকম ওয়েদারে ওভারকোট পরে, ছাতা মাথায় সাহেবরা মার্ডার বা মাগিবাজি করতে বেরিয়ে পড়ে। এরকমই হয়ে আসছে

লর্ড ও লেডিদের দেশে। বাঙালি ওসব হুজ্জুতিতে নেই। তারা ক্যাঁতামুড়ি দিয়ে কেলিয়ে পড়ে থাকে।

বোঁ...ও...ও...ও...বোঁ...হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ উড়েই চলেছে, উড়েই চলেছে।

এর মধ্যেই কলকাতার গড়িয়াহাট এলাকার ফুটপাথ দিয়ে বৃষ্টির জল গড়াতে থাকা উইন্ডচিটার পরে একটি মাতাল গরিলা ও ততোধিক মাতাল একটি শিমপানজি চলছিল। গরিলাটি ফায়ারম্যান এবং শিমপানজিটা হলো পারিজাত ,যে বেবি কে বা বেবি খানকির সঙ্গে লিভ টুগেদার করে। দুজনে এতক্ষণ গরচার ঠেকে বাংলা খাচ্ছিলো। এরকম ওয়েদারে এটা হওয়াই স্বাভাবিক।

—মালগুলো কোত্থেকে উড়ে এল বলতো?

—কেন? কাগজে তো দিয়েছে। দেখনি?

—না।

—চীন থেকে। মেড ইন চায়না।

—উল্টোটাও কি হয়?

—মানে?

—মানে ইন্ডিয়া থেকে পঙ্গপাল চীনে চললো। হয় না?

—জানিনা। একটু আগে কী একটা বলছিলে যেন। মানে ঐ পেট্রলখাগিটাকে নিয়ে।

—হ্যাঁ, বলছিলুম ফিরে গিয়ে কী দেখব

জানি না। হয়তো দেখব কেটে পড়েছে।

—তোমাকে কথাটা পই পই করে কত বলেছি। কানেই নিলেনা।

—কোন্ কথাটা?

—অনেকদিন তো ওর সঙ্গে মস্তি মারলে। এবার ওটাকে ভাগিয়ে ফের বৌ বালবাচ্চার কাছে ব্যাক করো।

—পারচি কই?

—উঁঃ!

—বলচি পারচি কই? গেলে তো যাওয়াই যায়। কিন্তু ভাবি ও তো মরে যাবে। কেউ লিটার, লিটার পেট্রল ওকে খোরাকি যোগাবে? যে রেটে দাম বাড়ছে।

—তোমারও তো ব্লাডে পেট্রল মিশে গেচে। মরবে। বেঘোরে মরবে। যদি সত্যি করে মন থেকে ঠিক করো যে ওকে ছাড়বে তাহলে বলবে। একটা জায়গায় নিয়ে যাবো।

—কোথায়?

—সে একজনের কাছে। মন্তর দিলেই দেখবে ভূতের ভর কেটে যাবে।

—কে সেই তোমার একজন?

—কী হবে জেনে তোমার?

—বলোই না।

—তিব্বতী এক লামা। হেবি চেনা আমার।

দেখলে ঘাবড়ে যাবে। আমার চেয়েও আড়ায় বড়। জোব্বা পরা। রং-বেরং-এর পাথরের মালা গলায়। ন্যাড়া।

—ভয় হচ্চে।

—ভয়ের কী আছে? ভয়ের কিছু তো নেই। তবে গ্যাঁও গ্যাঁও করে যখন মন্তর পড়ে তখন একটু শিরশিরে লাগে। কিচ্ছু করে না। কতজনকে দেকলুম—প্রবলেম সলভ করে দিল।

বোঁ...ও...ও ...বোঁ...ও...ও।

মেঘলা অন্ধকার আকাশ দিয়ে হাজার হাজার উড়ে চলেছে তো চলেছেই। ঝিরঝিরে বিষ্টি, ঠাণ্ডা—কিছুই গায় মাখছে না। পারিজাত কথা ঘোরায়,

—এরকম ওয়েদারে কিন্তু তোমার ভাল, তাই না?

—কেন? ভাল কেন?

—এই স্যাঁতস্যাঁতে ঠাণ্ডায় আগুন-ফাগুন লাগে না। ফায়ার ব্রিগেডেরও কাজ নেই।

—ঘেঁচু। লাগার হলে ঠিক লাগবে। সে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়লেও লাগবে। এই যে বাড়িগুলো দেখচ দুপাশে, সব জানবে সিন্থেটিক মাল। প্লাস্টিকের দরজা, জানলা, মায় টেবিল, চেয়ার সব। তার আবার যত রকম গোলমেলে রঙ করা। একটু ফায়ার পেলেই হলো। হু হু

করে ধরে যাবে। তারপর তোমার গিয়ে মোটরগাড়ি, বাইকের গাদা। কেউ ঠেকাতে পারবে না। দাঁড়াও, একটা সিগারেট ধরাই। সরে যাও। দপ্ করে হয়তো তুমিই ধরে গেলে।

পারিজাত সরে যায়। ফায়ারম্যান সিগারেট ধরায়। চোখ বন্ধ করে টানে। চলতে থাকে।

—আমার মন বলছে আজ একটা কিছু হবে।

—ভাল না খারাপ?

—খারাপ। সব সময় খারাপ। আমরি-তে আগুন লাগার দিনও মন বলেছিল আমার। একটা কিছু হবে। হবেই। আমি সামনের মোড়টায় ডান দিকে ভাঁজ মারবো। তুমি যাবে সোজা। বাস ধরবে?

—না, হাঁটব।

—আমি শেয়ারের অটো নিয়ে নেব। জানো, আমরির কেসটার পর থেকে একটা কালো চশমা আমার পিছু ছাড়ে না!

—মানে।

—কেবিনের মধ্যে একটা মোটা বুড়ো, বুজলে? ধোঁয়ার দম আটকে মরে গেছে। আর তার চশমাটা বুঝলে, ধোঁয়াতে ঝুল পড়ে কালো হয়ে গেছে। পুরো কালো।

—তারপর?

—ঐ চশমাটার কথা বার বার মনে পড়ে।

যেন দুটো চোখে কাজল ধেবড়ে মাখামাখি হয়ে গেচে। মনে রেখ, আজ একটা কিছু হবে।

—আর একটু যাবে না?

—না। আর দেরি করলে অটো পাব না। চলি।

পারিজাত এবার একাই হাঁটতে থাকে। ফায়ারম্যান চলে গেল। কালো ঝুলপড়া চশমার গল্পটা নিয়ে ফায়ারম্যান চলে গেল।

বোঁ...ও...ও...বোঁ...ও...ও

ফায়ারম্যান কেন বলে গেল যে আজ একটা কিছু হবে! হবেই। তবে কি ঐ লামাটাই ফায়ারম্যানকে কিছু বলেছে? এটাও দেখল পারিজাত যে ফায়ারম্যানের দেখা ঐ আমরির ঝুলপড়া চশমাটাও মাথার মধ্যে ঢুকে ঘুরপাক খাচ্ছে।

এরপর গল্পটা যে সাঙ্ঘাতিক মোড়টা নেবে, সেটা অবশ্যই লেখকের কেরামতি বা মেরামতি, সেটা দেখে নেবার পরে মাননীয় পাঠককে একটি নিরামিষ সুপারিশ—পরে ফুরসৎ বুঝে দুটি বই পড়ে নেবেন,

(১) নো ইজি ডে—লেখক মার্ক ওয়েন।

(২) অ্যামেরিকাস সিক্রেট ক্যাসপেইন এগেনস্ট আল কায়দা—লেখক এরিক স্মিট ও থম শ্যানকের।

শেষোক্ত বইটির লেখকদ্বয় স্বনামধন্য সাংবাদিক এবং প্রথম বইটির লেখক হলেন অ্যাবোটাবাদে ওসামা বিন লাদেনকে হত্যা করার জন্য যে মার্কিন নেভি সিল-দের যে দলটি গিয়েছিল তার লিডার। আখড়ায় যখন নামতেই হবে তখন কাছা খুলে নামাই ভাল। হাফজাস্তার এলেমেলো দিয়ে কড়াই তাতিয়ে লাভ নেই।

ফায়ারম্যান আছে ভাল। বাড়ি ফিরে পোষা হুলোটাকে চটকাবে। তারপর গিয়ে কলতলায় হাত পা ধোবে। তারপর বউয়ের সঙ্গে বসে টিভিতে নিউজ দেখবে। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে মৌরি চিবোতে চিবোতে একটা চারমিনার ধরিয়ে মৌজ করে খাবে। আর পারিজাত? বেশি না বলাই ভাল!

মোড় ঘুরলেই পারিজাতের এলাকাটা দেখা যায়। ও কি? জানলাগুলো সব খোলা। আলো জ্বলছে। বাইরে ওটা কে? বেবি কে। ভেতরে দুটো জেরিক্যানে পাঁচ পাঁচ দশ লিটার পেট্রল রয়েছে। পারিজাত এগিয়ে যায়।

—রাস্তায় কেন? কী হলো?

—ঘরে ঢুকে পড়েচে।

—কী? পঙ্গপাল?

—দেখতে পঙ্গপালের মতো। কিন্তু পঙ্গপাল নয়।

—মানে?

—আলো জ্বলছে নিবছে। পিঁক পিঁক সব করচে। ভয় লাগল। বেরিয়ে এলাম।

পঙ্গপালের ঝাঁকের সঙ্গে মিশেছিল কয়েকটা মিনিয়েচার ড্রোন—পুরোটাই সি. আই. এ-র একটা সিক্রেট অপারেশন। বেবি কে পঙ্গপাল দেখবে বলে জানলা খুলেছিল। তখনই ড্রোনগুলো ঢুকে পড়ে। ঘরে ঢুকে ওরা স্পেশাল সেন্সর দিয়ে স্টাডি করে পেট্রলের জেরিক্যানগুলো টার্গেট করছিল। যদিও এগুলো পরে জানা যায়।

—কী বললে? আলো জ্বলচে নিবচে? পিঁক পিঁক শব্দ।

—হ্যাঁ, দেওয়াল বেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—পঙ্গপাল তো ওরকম করবে না।

—ওগুলো পঙ্গপাল নয়।

পারিজাতের মাথার ঘুরপাকে ফের ফিরে এল ফায়ারম্যানের কথাটা। আজ কিছু একটা হবে। হচ্ছে। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না পারিজাত। এই সময়ে পেট্রলের দুটো জেরিক্যানই ফাটলো আর আগুনের হলকা আর ঢেউ জানলা দিয়ে দাউ দাউ করে বেরিয়ে এল। অনেকগুলো মলোটভ ককটেল একসঙ্গে ফাটলে এরকম বিশাল আগুন তৈরি হতে পারে। পরে ছাইয়ের মধ্যে ফায়ারব্রিগেড দলামোচড়ানো মিনিয়েচার

ড্রোনগুলো পায়। এবং পুলিশ সেগুলো নিয়ে যায়।

সেই দাউ দাউ আগুনের মধ্যে পঙ্গপালগুলো আকাশ থেকে নেমে ঢুকে যাচ্ছিল আর চিড়বিড় করে পুড়ছিল। আগুনের তাত থেকে বাঁচতে দূরে সরে গিয়েছিল। অতগুলো পতঙ্গদের একসঙ্গে দাহ হওয়ার জন্যে চেনা একটা গন্ধ ম ম করছিল বাতাসে। বেবি কে পারিজাতকে বলেছিল,

—দেখেচ, কেমন ক্যাওড়াতলার সেন্ট বেরিয়েচে...